লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৭ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহমদী

The Fortnightly Ahmadi

Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ১২শ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ | ৪ জমা. আউ, ১৪৪১ হিজরি | ৩১ ফাতাহ্, ১৩৯৮ হি. শা. | ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ ঈসাব্দ

Baitul Huda
Moschee, Usingen, Germany

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের **জাতীয় ওয়াকফে নও ইজতেমা ২০১৯-এ**
বক্তব্য রাখছেন **মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম**, ইনচার্জ, কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, ইউ. কে.

সম্পাদকীয়

সফলতা: পবিত্রতার অপর নাম
পবিত্রতা অবলম্বন নিজেরই স্বার্থে

তাক্ওয়া হচ্ছে- আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সব ধরণের পাপ এড়িয়ে চলা, এবং প্রত্যেক সেই কাজ করা আল্লাহ্ তা'লা যা করার আদেশ দিয়েছেন, আর এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা যা করতে আল্লাহ্ তা'লা বারণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বার বার বলেছেন, তিনি আত্মাকে পবিত্র করে থাকেন, আর তাঁকে কখনো এবং কোন ভাবেই ধোকা দেয়া যায় না।

হাদীসে এসেছে, কর্মের ফলাফল নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল। মানুষের মনের অবস্থা সম্পর্কে খোদা তা'লা সম্যক অবগত, বান্দার সকল কর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি অবহিত। বাহ্যিকভাবে যারা পূণ্যকর্ম করে, ইবাদতকারী, রোযাদার, এমনকি কতক মানুষ এমনও রয়েছে যারা কয়েকবার হজ্জও করেছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে, যদি তাদের নিয়্যতের ত্রুটি থাকে তবে তা আল্লাহ্ তা'লার নিকট গৃহীত হবার অযোগ্য। এ সমস্ত ইবাদত ও নেকী শুধু প্রত্যাখ্যাতই হয় না বরং আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, এগুলো ধ্বংসেরও কারণ।

কিন্তু এটাও মানুষের ওপর আল্লাহ্ তা'লারই অনুগ্রহ যে তিনি তাদেরকে সতর্ক করেন আর মনোযোগ আকর্ষণ করান যে, সতর্ক হয়ে যাও; সর্বোপরি আপন করুণায় ক্ষমার নিশ্চয়তাও দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার সতর্ক করা প্রকৃত পক্ষে মানুষের মঙ্গলের জন্য এবং সহজ-সরল পথে পরিচালিত করার জন্য। তাই তিনি এ সুসংবাদও দিয়েছেন, হৃদয়ে যদি তাক্ওয়া থাকে, নিয়্যত পরিস্কার হয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সৎকর্মের চেষ্টা করা হয় তবে যেসব ভুল-ত্রুটি ও পদস্খলন ঘটে থাকে তা নিজ ক্ষমার চাদরে তিনি ঢেকে রাখেন। মাটি থেকে সৃষ্ট আর মাতৃগর্ভে ভ্রুণরূপে বেড়ে ওঠা মানুষের নিজেদেরকে অনর্থক পুত-পবিত্র মনে না করাই শ্রেয়। কে মুত্তাকী, তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন।

নেককর্ম হচ্ছে সেই কাজ যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করা হয়। নেক কাজে অনেক ক্ষেত্রে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেতে পারে। কোন পুণ্যকর্ম করে অহংকারী হওয়ার পরিবর্তে নেককর্ম যেন মানুষের বিনয় ও তাক্ওয়াকে আরো উন্নত করে। কোন মানুষ নিজেকে নিজে তাক্ওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সনদ প্রদান করতে পারে না আর অন্য কাউকে তাক্ওয়ার সনদ প্রদান করাও কোন বান্দার কাজ নয় বরং এটা আল্লাহ্ তা'লার কাজ। আল্লাহ্ তা'লাই এ কথা সবচেয়ে ভাল জানেন যে, মুত্তাকী কে?

শ্রেষ্ঠত্বকে নিজের প্রতি আরোপ করা হলে আর কোন বিশেষ যোগ্যতা রয়েছে মনে করা হলে, সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ ভুলে এমন কর্ম হবে আত্মশুদ্ধি পরিপন্থী । কিন্তু যদি নিজের পরাকাষ্ঠার সাধুবাদ প্রভুকে দেয়া হয় আর বিশ্বাস রাখা হয় যে, সকল প্রকার নিয়ামত আল্লাহ্ তা'লারই দান এবং নিজের উৎকর্ষতা দেখে আমিত্ব নয় বরং চতুর্দিকে আল্লাহ্ তা'লার শক্তি, তাঁর সামর্থ, তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর কৃপার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় এবং নিজেকে গোসলদাতার হাতে মৃত লাশ-সদৃশ জ্ঞান করা হয় এবং নিজের নফসের প্রতি কোন পরাকাষ্ঠা আরোপ না করা হয়, তাহলে এটিকে বলা হয় আল্লাহ্‌র নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ। *(হামামাতুল বুশরা– রূহানী খাযায়েন-৭ম খন্ড-পৃ:-৩২১-৩২২)*

খোদার ভয় হৃদয়ে লালন করে নিজ আত্মাকে পবিত্র করার সাধনায় রত থাকতে হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার ভয় থাকলেই পাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে আর তাহলেই খোদা তা'লার দৃষ্টিতে মানুষ পবিত্র আখ্যায়িত হয় এবং যখন খোদা তা'লার দৃষ্টিতে মানুষ পবিত্র হয় তখন সেটিই আসল সম্মানের মোকাম যেখানে মানুষকে খোদা তা'লা পবিত্র করে প্রবিষ্ট করেন। সেই সম্মান প্রকৃত সম্মান নয়, যদ্দারা মানুষ আত্মম্ভরিতা ও অহংকার বশে স্বীয় পুণ্যকর্ম প্রকাশের মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার দাবী করে।

রাগ কোন সাধারণ পাপ নয়। যদি একে নিয়ন্ত্রণ না করা হয় পরন্তু এর অন্যায় ব্যবহার করা হয় তাহলে এটি বড়-পাপে রূপ নেয়। অনেক সময় রাগ ধরলেও মানুষ ক্রোধের বশীভূত হয় না বরং মানুষ এর বৈধ ব্যবহার করে যাতে অন্যের সংশোধন হয়।

যদি মানুষ ক্রোধের বশীভূত হয়ে পড়ে তাহলে আত্মা আর পবিত্র থাকে না। তাই যদি পবিত্র হতে চাও আর সত্যিকার পবিত্রতা কামনা করো তাহলে তোমাদের চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন করো।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সর্বদা আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ দিন। আমরা যেন খোদা তা'লাকেই সকল পুণ্যকর্মের উৎস জ্ঞান করি। সকল পাপ হতে নিজেকে পবিত্র করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি আর সর্বদা খোদা তা'লার ক্ষমার সন্ধানী হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

> আমাদের সন্মানিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীগণকে বিজয়-মাস ডিসেম্বরের আনন্দ-শুভেচ্ছাসহ **'বিদায়- ২০১৯'** আর একই সাথে রইল **২০২০ সনের আগাম শুভেচ্ছা।**
> অনাবিল আনন্দে ভরে উঠুক **"শুভ নববর্ষ!"**

সূচিপত্র

৩০ নভেম্বর ২০১৯

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ৬

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৫ এপ্রিল, ২০১৯ মোতাবেক ০৫ শাহাদত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ** ৮

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা ১৮
মাওলানা সাব্বির আহমদ, মুরুব্বি সিলসিলাহ্

এতায়াতে নেযাম ২২
মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ্

গত ২৬শে অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানির সাবেক সদর জনাব হাসানাত আহমদ সাহেবের বিদায়ী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর বক্তব্য ২৫

কবিতা– এমটিএ খোদার এক মহাদান ২৬
খন্দকার মাহবুবউল ইসলাম

স্মৃতির পাতা থেকে– ৫ম খিলাফতের প্রথম শহীদ শাহ্ আলম সাহেবের স্মরণে ২৭
সংকলনে: মোহাম্মদ জাহিদ হাসান আব্দুল্লাহ্

ঘুরে আসলাম পবিত্র স্থান কাদিয়ান ২৯
খালেদ বিন কাসেম

সংবাদ ৩১

পাক্ষিক 'আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন

www.theahmadi.org

পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ কাহ্‌ফ-১৮

৬২। এরপর তারা দু'জন যখন দুই (সমুদ্রের) সংযোগস্থলে পৌঁছলো তারা তাদের মাছের কথা[১৭০৫] ভুলে গেল এবং সেটি দ্রুতবেগে সমুদ্রে নিজ পথ ধরলো।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ
سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦٢﴾

৬৩। এরপর তারা উভয়ে যখন (সে স্থান ছেড়ে) সামনে এগিয়ে গেল তখন সে তার যুবক (সঙ্গীকে) বললো, 'আমাদের সকালের খাবার[১৭০৬] আমাদের কাছে নিয়ে আস। নিশ্চয় আমরা আমাদের এ সফরের দরুন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۫ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ
سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٣﴾

৬৪। সে বললো, 'তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে আমরা যখন (বিশ্রামের জন্য) শিলাখণ্ডে[১৭০৭] আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? আর (তোমার কাছে)-এর কথা উল্লেখ করতে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর সেটি অদ্ভুতভাবে সমুদ্রে নিজের পথ ধরেছিল,

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ
الْحُوْتَ ۫ وَمَاۤ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ
وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٤﴾

৬৫। সে বললো, 'এটাই তো (সেই স্থান) যা আমরা খুঁজে ফিরছিলাম।' এরপর তারা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে ফিরে গেল।

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰۤى
اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ۙ ﴿٦٥﴾

৬৬। তখন (সেখানে) তারা আমাদের বান্দাদের মাঝ থেকে এক মহান বান্দাকে[১৭০৮] দেখতে পেল, যাকে আমরা নিজ পক্ষ থেকে (বিশেষ) রহমত দান করেছিলাম এবং আমাদের পক্ষ থেকে তাকে (বিশেষ) জ্ঞানও দান করেছিলাম।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا
وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٦﴾

১৭০৫। 'হূত' অর্থ মাছ। কাশফে মাছ দেখার ব্যাখ্যা ধার্মিক লোকদের ইবাদতগৃহ (তাতিরুল আনাম)। এই অর্থে 'যখন তারা দুই (সমুদ্রের) সঙ্গমস্থলে পৌঁছলো তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেল,' এই বাচনভঙ্গী বা অভিব্যক্তির মর্ম দাঁড়ায় যখন মূসায়ী শরীয়ত এবং ইসলামী শরীয়ত মিলিত হবে, অর্থাৎ মূসায়ী বিধান যখন কার্যকর থাকবে না, উপেক্ষিত হবে এবং যখন ইসলামী শরীয়ত কার্যকরী হবে, সেই সময়ে হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের নিকট থেকে প্রকৃত ধর্মপরায়ণতা উঠে যাবে এবং তখন থেকে নতুন শরীয়তের অনুসারীরা বিশেষরূপে চিহ্নিত হবে (৪৮:৩০)।

১৭০৬। কাশফে নাস্তা বা সকালের খাদ্য চাওয়ার অর্থ 'ক্লান্তি' (তাতীরুল আনাম) এবং আয়াতের দাবি যে, 'দু'টি সমূদ্রের সঙ্গমস্থল' অতিক্রম করার পর এবং দীর্ঘকাল তাঁরা পৃথকভাবে ভ্রমণ করে এবং প্রতিশ্রুত নবীর জন্য (দ্বিতীয়-১৮:১৮) প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে মূসা (আ.) এবং তাঁর যুবকসঙ্গী বিস্ময়ে ভাবতে শুরু করবে যে, তিনি (প্রতিশ্রুত নবী) হয়ত পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে চিনতে তাঁরা ব্যার্থ হয়েছেন। আয়াতের মধ্যে মূসা (আ.) এবং তাঁর যুবক সফরসঙ্গী (ঈসা আ.) যথাক্রমে ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের প্রতীক।

১৭০৭। 'সাখরাহ্' অর্থ পাথর। কাশফ এবং স্বপ্নের ভাষায় এর অর্থ অধর্ম এবং পাপময় জীবন। অতএব আমরা যখন (বিশ্রামের জন্য) শিলাখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম এই কথাটির মর্ম হলো, যখন দুই সমুদ্র মিলিত হবে, অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়ত শেষ প্রান্তে পৌঁছবে এবং এক নতুন নবী এবং নতুন শরীয়ত প্রকাশিত হবে তখন ইহুদী ও খ্রিষ্টানজাতি অপরাধবৃত্তি ও পাপাচারে নিমগ্ন থাকবে। আর সেটি অদ্ভুদভাবে সমুদ্রে নিজের পথ ধরেছিল বাক্যাংশটি প্রকাশ করছে, প্রকৃত সাধুতা এবং খোদা তা'লার ইবাদত এদের নিকট থেকে বিস্ময়করভাবে বিদায় নিবে।

হাদীস শরীফ

এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই

১। হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেনঃ এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সে অন্যের প্রতি যুলুম করে না এবং তাকে অন্যের হস্তে (যুলুমের উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করে না; যে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। যে কেউ মুসলমানের কষ্ট দূর করে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। যে কেউ মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিনে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেনঃ এক মুসলমান আর এক মুলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করে না। তাকে লাঞ্ছিত করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না। (বুকের ভিতরের দিকে তিনবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন) তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) এখানে। এক মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করা একজনের জন্য যথেষ্ট অন্যায়। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান অন্য একজন মুসলমানের নিকট পবিত্র। *(মুসলিম)*

৩। হযরত মুস্তাওবেদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অপর এক মুসলমানের গ্রাস আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ নিশ্চয় ওটার অনুরূপ তাকে দোযখ হতে আহার করাবেন। যে কেউ এক মুসলমানের কাপড় (ছিনিয়ে নিয়ে নিজে পড়ে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে ওটার অনুরূপ দোযখ হতে পড়াবেন; এবং যে কেউ অন্যের সম্মানহানি করে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তার সম্মানহানি করবেন। *(আবুদাউদ)*

এক মুসলমান আর এক মুলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করে না। তাকে লাঞ্ছিত করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না। (বুকের ভিতরের দিকে তিনবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন) তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) এখানে। এক মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করা একজনের জন্য যথেষ্ট অন্যায়। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান অন্য একজন মুসলমানের নিকট পবিত্র।

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্নিত আছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেনঃ নিশ্চয় তোমরা একে অন্যের জন্য দর্পণ-স্বরূপ। সে যদি তাতে কোন ধূলি দেখে, নিশ্চয় সে তা ঝেড়ে দেয়। (তিরমিযী)। এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর জন্য দর্পণ স্বরূপ এবং এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর ভাই; সে তার ক্ষতি প্রতিহত করে এবং তার পশ্চাৎ হতেও রক্ষা করে। *(আবু দাউদ, তিরমিযী)*

৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেনঃ একজন মুসলমান, যে সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল', তিনটি কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। এক-বিবাহের পর ব্যভিচার করলে তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতে হবে, দুই-আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে নিশ্চয় তাকে হত্যা করবে, অথবা ফাঁসি দিয়ে মারবে অথবা দেশ হতে বহিষ্কার করে দিতে হবে, তিন-সে কোন মানুষকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাকে হত্যা করতে হবে। *(আবুদাউদ)*

৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেনঃ একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অবশ্যই সহজ।

৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেনঃ দুই বান্দা, একজন পূর্বের এবং অপর একজন পশ্চিমের। যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পরকে ভালবাসে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে একত্রিত করে বলবেন, এ সেই ব্যক্তি, যাকে তুমি আমার জন্য ভাল বেসেছিলে। *(বায়হাকী)*

অমৃতবাণী

কুৎসা রটনা এক জঘন্য পাপ, যা ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

অন্যায় সন্দেহ (বদযন্নি) এক মারাত্মক আপদ। এটা শীঘ্র ঈমানকে ভস্মীভূত করে, যেভাবে জ্বলন্ত অগ্নিড়বশিখা শুষ্ক খড় ও তৃণকে ভস্মীভূত করে থাকে। যে ব্যক্তি খোদার প্রেরিত পুরুষদের সম্বন্ধে সন্দিহান হয়, খোদা স্বয়ং তার শত্রু হয়ে যান এবং এরূপ ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হন। তিনি তাঁর মনোনীত পুরুষদের সম্মান সম্বন্ধে এমন মর্যাদাবোধ পোষণ করেন যে, কারও মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যায় না। যখন আমার বিরুদ্ধে নানা প্রকার মোকদ্দমা আনয়ন করা হয়েছিল, তখন খোদার সেই মর্যাদাবোধ আমার জন্য উদ্বেলিত হয়েছিল। *(রূহানী খাযায়েন, ২০ খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)*

আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, কুৎসা রটনা করা এক জঘন্য পাপ, যা ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়, সত্য হতে অনেক দূরে নিয়ে যায় এবং বন্ধুত্বকে শত্রুতায় পরিণত করে দেয়। সিদ্দিকীয়তের মর্যাদা লাভের জন্য কুৎসাকে পরিহার করা আবশ্যক। যদি ভুলবশতঃ কেউ কুৎসা করে ফেলে, তাহলে সে যেন অনুতপ্ত হয়ে খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয় এবং দোয়া করতে থাকে যে, আগামীতে যেন এমেন মন্দ কাজ তার দ্বারা না হয়। খোদা যেন তাকে এরূপ ব্যভিচার হতে রক্ষা করেন। এ আধ্যাত্মিক ব্যাধিকে কেউ যেন হালকা করে না দেখে। এটা অত্যন্ত ভয়ানক এক ব্যাধি, যা ধীরে ধীরে আক্রান্তকারীকে ধ্বংস করে দেয়। *(মলফুযাত, ১ম খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা)*

তোমাদের উচিৎ, সহানুভূতি ও চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারা তোমরাও ‘রূহুল কুদুস’-এর ‘ঐশী আশিসের অংশ’ লাভ কর। কারণ রূহুল কুদুস ব্যতীত প্রকৃত তাক্ওয়া লাভ হয় না। প্রবৃত্তির বশবর্তিতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সেই পথ অবলম্বন কর, যা অপেক্ষা কোন পথই সংকীর্ণতর নয়। দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মুগ্ধ হয়ো না, কারণ এটা খোদা হতে দূরে নিক্ষেপ করে। খোদার নিমিত্তে কঠোর এবং বিষাদময় জীবন অবলম্বন কর। যে দুঃখ-ব্যাথায় খোদা সন্তুষ্ট হন, তা সেই সুখ-সম্ভোগ অপেক্ষা উত্তম, যার ফলে খোদা অসন্তুষ্ট হন। যে পরাজয়ে খোদা সন্তুষ্ট হন, তা সেই বিজয় অপেক্ষা উত্তম, যার দরুন খোদার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হয়। সেই প্রেম পরিহার কর যা খোদার ক্রোধের নিকটবর্তী করে। যদি তোমরা বিশুদ্ধ চিত্তসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হও, তবে তিনি সকল দিক দিয়েই তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং কোন শত্রু তোমাদের অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। *(রূহানী খাযায়েন, ২০ খন্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা)*

খোদা তা'লা কুরআন শরীফে তাক্ওয়াকে ‘পোষাক’ বলে অভিহিত করেছেন। ‘লেবাসুত্ তাক্ওয়া’ কুরআন শরীফের শব্দ, যা এদিকে ইঙ্গিত করে থাকে যে, আধ্যাত্মিক-সৌন্দর্য ও শোভা তাক্ওয়া দ্বারাই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অঙ্গীকার এবং অনুরূপভাবে সৃষ্টির সকল আমানত ও কর্তব্যকে যথাসম্ভব পূর্ণ করবে, অর্থাৎ-এর সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম রীতিকেও যথাসম্ভব পালন করবে। *(রূহানী খাযায়েন, ২১ খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)*

আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য শক্তির অধিকারী। কিন্তু মাত্র সেই ব্যক্তিই তাঁর আশ্চর্যলীলা দর্শন করতে পারে, যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তাঁর শক্তিতে দৃঢ়-বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁর একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক নয় এবং তাঁর আশ্চর্যলীলাসমূহ প্রদর্শন করে না, কত হতভাগ্য সে-ব্যক্তি। যে আজও জানে না যে, তার এরূপ এক খোদা আছেন, যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(রূহানী খাযায়েন, ১৯ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা)*

আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, কুৎসা রটনা করা এক জঘন্য পাপ, যা ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়, সত্য হতে অনেক দূরে নিয়ে যায় এবং বন্ধুত্বকে শত্রুতায় পরিণত করে দেয়। সিদ্দিকীয়তের মর্যাদা লাভের জন্য কুৎসাকে পরিহার করা আবশ্যক। যদি ভুলবশতঃ কেউ কুৎসা করে ফেলে, তাহলে সে যেন অনুতপ্ত হয়ে খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয় এবং দোয়া করতে থাকে যে, আগামীতে যেন এমেন মন্দ কাজ তার দ্বারা না হয়। খোদা যেন তাকে এরূপ ব্যভিচার হতে রক্ষা করেন। এ আধ্যাত্মিক ব্যাধিকে কেউ যেন হালকা করে না দেখে। এটা অত্যন্ত ভয়ানক এক ব্যাধি, যা ধীরে ধীরে আক্রান্তকারীকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

(৩৭তম কিস্তি)

যে খেলাফত আদম (আ.) হতে শুরু হয়েছিল সেটি পরিশেষে খোদা তা'লার পরিপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় হিকমত বা প্রজ্ঞায় (মসীহ্‌রূপ) আদমের ওপরই সমাপ্ত হলো। উল্লেখিত এই হিকমত ও প্রজ্ঞাই নিম্নবর্ণিত ইলহামে নিহিত: **'আরাদ্‌তু আন্ আস্তাখ্‌লিফা ফাখালাক্‌তু আদামা'** অর্থাৎ 'আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করার অভিপ্রায়ে আদমকে সৃষ্টি করি'। সহীহ্ হাদীসসমূহের বিশেষ আলোকপাত অনুযায়ী যেহেতু যুগের আবর্তনের এটাই সময়, সেহেতু আল্লাহ্ তা'লা অগ্র-পশ্চাতে একই রকম মিল করার লক্ষ্যে আখেরী যুগে আগমনকারী খলীফা ঈসার নাম আদম রেখেছেন। আর আদম এবং ঈসার মাঝে আধ্যাত্মিকভাবে কোনো বৈপরীত্য নেই, বরং সাদৃশ্য রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন: **'ইন্না মাসালা ঈসা ইন্দাল্লাহে কামাসালে আদামা।'** *[(আলে ইমরান ঃ ৬০) অর্থাৎ 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমেরই অনুরূপ' – অনুবাদক]।*

যদি এই আপত্তি করা হয়, খোদা তা'লা যদিও এক অভিনব পন্থায় কুরআন করীমে স্পষ্টত বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামে আল্লাহ্ প্রেরিত ঐশী খলীফাগণের মাঝে আখেরী যুগে পাঠানো খলীফা আধ্যাত্মিকভাবে এমন এক খলীফার রূপ ও রঙ ধারণ করে আসবেন যিনি ইসরাঈলী খলীফাগুণের মাঝে আখেরী খলীফা ছিলেন, অর্থাৎ মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম। কিন্তু খোদা তা'লা কী কারণে (পবিত্র কুরআনে) উল্লেখিত এ ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পষ্টাক্ষরে ইবনে-মরিয়মের নাম ধরে বর্ণনা করেন নি যদিও সেটিই নিরূপিত হয়?

এর উত্তর হলো, যাতে মানুষ ভুল বুঝার দরুন পরীক্ষায় না পড়ে। কেননা, খোদা তা'লা যদি নাম ধরে বর্ণনা করতেন যে, এই উম্মতের আখেরী খলীফা সেই মরিয়ম-পুত্র মসীহ্ (আ.) হবেন, তবে নাদান মৌলবীদের জন্য পরীক্ষা এবং ভুল বোঝার বিপদ আরো বেড়ে যেত। অতএব, খোদা তা'লা স্বীয় বর্ণনায় দুটি পন্থা বেছে নেয়া পছন্দ করেছেন। একটি তো হাদীসাবলীতে বিদ্যমান, সেখানে 'ইবনে-মরিয়ম' শব্দ মওজুদ রয়েছে। আর দ্বিতীয় পন্থাটি পবিত্র কুরআনে আছে যা এইমাত্র বর্ণিত হল। তদনুযায়ী সেই 'মসীহ্ মাওউদ' যাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতি পবিত্র কুরআনে রয়েছে, তিনি যে এই অধম– এ বিষয়ের সত্যতা নিম্নবর্ণিত দলিল-প্রমাণ, চিহ্ন ও লক্ষণ এবং কারণ ও দিক্‌নির্দেশনার মাধ্যমে প্রত্যেক সত্যান্বেষীর ওপর বিশদভাবে উন্মোচিত হবে।

(১) এগুলোর একটি হল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের আবশ্যকীয় সময়েই এ অধম এসেছে। কেননা, 'আল আয়াতু বা'দাল মিয়াতাইন'–হাদীসটির অর্থ হল, 'বৃহৎ নিদর্শনাবলী' (হি.) তেরো শতাব্দীতে প্রকাশিত হবে। এ কারণেই নিশ্চিত ও অব্যর্থভাবে প্রমাণীত হয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাব বা জন্ম ত্রৈয়োদশ শতাব্দীতে হবে। বস্তুতপক্ষে ক্ষুদ্র চিহ্নসমূহ তো মহানবী (সা.)-এর মুবারক সময়কাল থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। অতএব নিঃসন্দেহে 'আল্-আয়াতু' বলতে বৃহৎ চিহ্নাবলীকে বুঝায় যা দু'শ বছর কালের ভেতর প্রকাশিত হতে পারতো না। এ কারণে (দু'শর সাথে হাজার যোগ হয়ে) ত্রৈয়োদশ শতাব্দী বোঝায় বলে সকল উলামার ঐক্যমত হয়েছে এবং 'আল্ আয়াত' বলতে বৃহৎ চিহ্নাবলী অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাব, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের খুরূজ বা বহিপ্রকাশ ইত্যাদি বোঝায়। আর এ বিষয়টিও সবাই অনুধাবন করতে পারেন যে, (প্রতিশ্রুত) মসীহ্‌র আবির্ভাবের নির্ধারিত সময়কালটিতে এ অধম ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহ্ প্রেরিত মসীহ্ মাওউদ রূপে আগমনের দাবী করে নি। বরং এই

তেরোশ' বছর যাবৎ কোন মুসলমানের পক্ষ থেকে উল্লেখিত দাবীর নজির নেই। তবে কতিপয় খ্রিষ্টান বিভিন্ন সময়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবী করেছিল। অতএব, কিছুকাল পূর্বে আমেরিকায়ও একজন খ্রিষ্টান মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম হওয়ার দাবী করার আসপর্ধা দেখিয়ে ছিল। কিন্তু ঐ মুশরিক খ্রিষ্টানদের দাবী কেউ গ্রাহ্য করে নি। তবে ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার নিমিত্তে খ্রিষ্টানদের উল্লেখিত দাবী আবশ্যকীয় ছিল। কারণ, ইঞ্জিলে হযরত মসীহ্ বলেছিলেন, 'অনেকে আমার নামে আসবে এবং বলবে যে, তারা মসীহ্। কিন্তু সাচ্চা মসীহ্ এদের সবার শেষে আসবেন।' আর হযরত মসীহ্ তাঁর হাওয়ারীদের উপদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা সর্বশেষ আগমনকারীর জন্য অপেক্ষমান থাকো। আমার আগমন অর্থাৎ আমার নামে যিনি আসবেন তার সত্যতার চিহ্ন হবে যে, ওই সময় সূর্য ও চন্দ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে, নক্ষত্ররাজী ভূপৃষ্ঠে পতিত হবে এবং আকাশের শক্তিসমূহ দুর্বল হয়ে যাবে। তখন তোমরা আকাশে 'ইবনে আদম'-এর নিদর্শন দেখতে পাবে।" এ যাবতীয় ইঙ্গিত এ বিষয়ের প্রতি ছিল যে, ওই সময় প্রকৃত জ্ঞানের আলো উঠে যাবে এবং রব্বানী উলামা পরলোকগত হবেন এবং জাহেলিয়্যত বা অজ্ঞতার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়বে। তখনই 'ইবনে-মরিয়ম' (প্রতিশ্রুত মসীহ্) আসমানী নির্দেশে আত্মপ্রকাশ করবেন।' এ ইঙ্গিতই সূরা 'যিলযালে' এ মর্মে রয়েছে যে, ওই সময় পৃথিবী প্রচণ্ড ভূমিকম্প সমূহে আলোড়িত হবে এবং পৃথিবী তার সব ভাণ্ডার ও গোপন বিষয় প্রকাশিত করবে অর্থাৎ জড়বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। কিন্তু আসমানী (আধ্যাত্মিক) জ্ঞানরাশী সমৃদ্ধ হবে না। **'ইয়াওমা তা'তিস্ সামাউ বিদুখানিম্ মুবীন'** *[(সূরা আদ্ দুখান : ১১) অর্থঃ 'যে-দিন আকাশ প্রকাশ্যে এক বিরাট ধুম্রসহ উপস্থিত হবে' –অনুবাদক]।*

(২) তন্মধ্যকার একটি প্রমাণ এটি যে, উচ্চস্তরের আওলিয়া কিরামের 'কাশ্‌ফ' (দিব্য অভিজ্ঞান) সর্ব সম্মতিক্রমে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাব (হি.) চৌদ্দ শতাব্দীর প্রথমে এরই শিরোভাগে হবে এবং এই শিরোভাগকে অতিক্রম করবে না। সুতরাং আমরা উদাহরণস্বরূপ কিছু পরিমাণ উল্লেখিত কাশফ এ পুস্তকে লিখেও এসেছি। আর এটা স্পষ্ট যে, এ সময়ে এই পদমর্যাদার দাবীদার এ অধম ছাড়া অন্য কেউ নেই।

(৩) তন্মধ্যকার একটি প্রমাণ এই যে, অনেক আগেই দাজ্জাল দলটি আত্মপ্রকাশ করেছে এবং অত্যন্ত জোরে-শোরে এর প্রকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। দাজ্জালের গাধাটিও যে প্রকৃতপক্ষে তারই বানানো সেটি সহীহ হাদীসাবলীর বর্ণনা ও এর মর্ম অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিমে সর্বত্র ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে ফিরছে। ওই গাধা প্রকৃতপক্ষে হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক দাজ্জাল কর্তৃকই নির্মিত হওয়া এ যুক্তিতে প্রমাণিত হয় যে, এরকম গাধা সাধারণভাবে কোনো মা-গর্ধবির গর্ভজাত হয়ে থাকলে এ প্রকারের অনেকগুলো গাধা সাম্প্রতিককালেও মওজুদ থাকা আবশ্যিক ছিল। কেননা উচ্চাতায়, চলাফেরায় ও শক্তি সামার্থ্যে স্বীয় জনক-জননীর সঙ্গে শবকের সাদৃশ্য স্বতঃসিদ্ধভাবে জরুরী। অতএব সহীহ হাদীসসমূহ এ দিকেই ইঙ্গিত দেয় যে, এই গাধাটি দাজ্জালের নিজেদের বানানো। কাজেই সেটি রেলগাড়ী নয় তো আর কী? অনুরূপভাবে ইয়াজুজ-মাজুজ জাতিগুলো বহির্প্রকাশ ও বিস্তার লাভ করছে। 'দাব্বাতুল আরয'ও জায়গায় জায়গায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। আকাশ থেকে নেমে আশা এক অন্ধকার 'দুখান' বা ধোঁয়া পৃথিবীকে ডেকে ফেলেছে। তারপরও এরূপ পরিস্থিতিতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ যদি আত্মপ্রকাশ না করে থাকেন তাহলে আবশ্যকীয়ভাবে ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা বলে সাব্যস্থ হতো। অতএব, এ অধমই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্। যিনি যথা -সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

যদি এ সন্দেহ উত্থাপন করা হয় যে, দাজ্জাল সম্পর্কিত চিহ্নসমূহ পরিপূর্ণরূপে এই ইংরেজ পাদ্রীসম্প্রদায় সমূহে কোথায়ই-বা প্রয়োগ হতে দেখা যায়? তবে এর উত্তর এই যে, পরিপূর্ণরূপে এ পুস্তকে প্রমাণিত করে এসেছি যে প্রকৃতপক্ষে এ লোকগুলোই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। গভীর দৃষ্টিপাতে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তারাই সামগ্রিকভাবে ঐসব চিহ্নের প্রতীক বলে প্রতীয়মান হয়। এ লোকগুলো তাঁদের শিল্প ও কারিগরি প্রযুক্তিতে, বিশাল আর্থিক প্রাচুর্যে বিজ্ঞচিত তদবীর ও পারদর্শী সিদ্ধহস্তে যেন সবকিছু করায়ত্ত করেছেন। আর এ আলামত বা চিহ্নটি যে দাজ্জাল কেবল চল্লিশ দিন (পৃথিবীতে) অবস্থান করবে এবং উক্ত কোন কোন দিন বছরকাল সমান হবে–এটি বাস্তব অর্থে ধর্তব্য হতে পারে না। কেননা, কোন কোন হাদীসে চল্লিশ দিনের পরিবর্তে বরং পাঁচচল্লিশ বছরও বর্ণিত হয়েছে। আবার কোন কোন দিন বর্ষকালেরও সমান হবে। এতে করে আবশ্যকীয়ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মরিয়মপুত্র হযরত মসীহ্ মৃত্যুবরণ করলেও দাজ্জাল জীবিতাবস্থায় বিরাজ করবে। অতএব, প্রকৃতপক্ষে বাস্তব বিষয় হচ্ছে, এ সমুদয় শব্দাবলী রূপক বিধায় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। দাজ্জালের মৃত্যু ঘটা দ্বারা এ জাতির মূলোৎপাটন নয়, বরং যুক্তি ও দলিল-প্রমাণে ঐ ধর্মের মূলোৎপাটন বোঝায়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সুনিশ্চিত ও অকাট্য দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে যে-ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং তার তুচ্ছতা, অসারতা ও অপদস্ততা প্রকাশ পায় সেটি নিঃসন্দেহে মৃত বলেই প্রতীয়মান হয়। *(চলবে)*

ভাষান্তর:
মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৫ এপ্রিল, ২০১৯ মোতাবেক ০৫ শাহাদত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

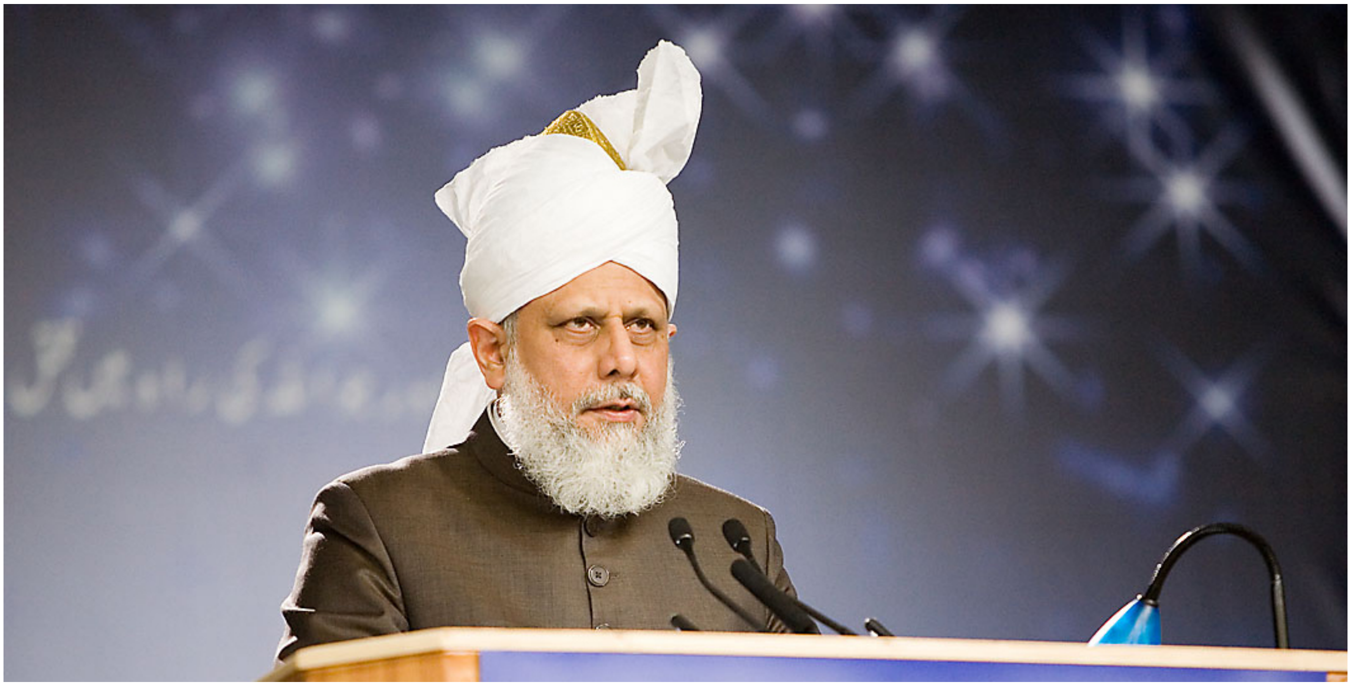

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহ্‌হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ আমি যেসব বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে প্রথম নাম হল, হযরত খিরাশ বিন সিম্মাহ্ আনসারী (রা.)'র। হযরত খিরাশ (রা.)' সম্পর্ক ছিল খাযরাজ গোত্রের বনু জুশাম শাখার সাথে। তার মায়ের নাম ছিল উম্মে হাবীব। হযরত খিরাশ (রা.)'র সন্তানসন্ততির মাঝে রয়েছেন সালামা, আব্দুর রহমান এবং আয়েশা। হযরত খিরাশ (রা.) বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদের যুদ্ধে তার (শরীরে) ১০টি আঘাত লাগে। তিনি মহানবী (সা.)-এর সুদক্ষ তিরন্দাজদের একজন ছিলেন। *(বৈরুত থেকে ১৯৯০ সনে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৫)*

বদরের যুদ্ধে হযরত খিরাশ (রা.) মহনবী (সা.)-এর জামাতা আবুল আস'কে বন্দী করেছিলেন। *(বৈরুত থেকে ২০০৯ সনে প্রকাশিত সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৩১২)*

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হল, হযরত উবায়েদ বিন তাইয়্যেহান (রা.)। তার নাম আতীক বিন তাইয়্যেহানও বলা হয়ে থাকে। তার মায়ের নাম ছিল লায়লা বিনতে আতীক। তিনি হযরত আবুল হাইসাম বিন তাইয়্যেহান এর ভাই ছিলেন। তিনি বনু আব্দুল আশহাল এর মিত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উবায়েদ (রা.) ৭০জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) তার এবং হযরত মাসুদ বিন রবী'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করেছিলেন। তিনি তার ভাই হযরত আব্দুল হাইসাম এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি (রা.) ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। ইকরামা বিন আবু জাহল তাকে শহীদ

করে। এটিও বলা হয়, তিনি সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)'র পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হন। এক্ষেত্রে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু উভয় রেওয়ায়েতের অভিন্ন মত হল, তিনি (রা.) শহীদ হয়েছেন। তার সন্তানসন্ততির মাঝে দুই পুত্র হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.) এবং হযরত আব্বাদ (রা.)'র উল্লেখ পাওয়া যায়। তাবরীর ভাষ্য অনুসারে হযরত আব্বাদ (রা.)ও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আর হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। *(বৈরুত থেকে ১৯৯০ সনে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪২-৩৪৩)*

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হল, হযরত আবু হান্নাহ্ মালেক বিন আমর (রা.)। আবু হান্নাহ্ ছিল তার ডাকনাম। মালেক বিন আমর ছিল তার আসল নাম। মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকদী তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে গণ্য করেছেন। তার নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তার নাম আমের ও সাবেত বিন নো'মানও বর্ণিত হয়েছে। তার ডাকনাম আবু হাব্বাহ্ এবং আবু হাইয়াহ্ও বর্ণনা করা হয়। কিন্তু মুহাম্মদ বিন আমর ওয়াকদী বলেন, আবু হাইয়াহ্ ডাকনামের দু'ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন আবু হাব্বাহ্ বিন গাযিয়্যাহ্ বিন আমর আর দ্বিতীয়জন হলেন, আবু হাব্বাহ্ বিন আবদে আমর আল্ মাযিনী। তাদের কেউই বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কারো ডাকনামই আবু হাব্বাহ্ ছিল না, বরং বদরের যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের ডাকনাম ছিল, আবু হান্নাহ্। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তার কথার ওপর জোর দেন যে, তার ডাকনাম আবু হান্নাহ্-ই ছিল। *(বৈরুত থেকে ১৯৯০ সনে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪২-৩৪৩) (বৈরুত থেকে ২০০৩ সনে প্রকাশিত আসদুল গাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬৩)*

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হল, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ বিন সা'লাবাহ্ (রা.)। তাকে আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী বলা হয়। তার ডাকনাম ছিল আবু মুহাম্মদ। তার পিতার নাম ছিল, হযরত যায়েদ বিন সা'লাবাহ্ (রা.) আর তিনিও সাহাবী ছিলেন। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু জুশাম শাখার সদস্য ছিলেন। তিনি (রা.) ৭০ জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশ নেন আর বদর, ওহুদ, খন্দকসহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় বনু হারেস বিন খাযরাজ এর পতাকা তার কাছে ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবী লিখতে জানতেন। অথচ সেই যুগে আরবে লেখার রীতি খুবই কম ছিল। অনেক কম মানুষই লিখতে জানতো। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.)'র সন্তানসন্ততি মদিনাতেই অবস্থান করেন। তার এক পুত্রের নাম ছিল মুহাম্মদ, যিনি তার স্ত্রী সা'দা বিনতে কুলায়েব এর গর্ভজাত। আর এক মেয়ে ছিল উম্মে হুমায়েদ, যার মা ইয়ামেন নিবাসী ছিলেন।

হুরায়েস বিন যায়েদ ছিলেন তার (রা.) ভাই, যিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। *(বৈরুত থেকে ২০০৩ সনে প্রকাশিত আসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৮) (বৈরুত থেকে ১৯৯০ সনে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৫-৪০৬)*

তার এক বোনের নাম ছিল কুরায়বাহ্ বিনতে যায়েদ (রা.)। তিনিও সাহাবীয়া ছিলেন। *(বৈরুত থেকে ১৯৯০ সনে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৭১-২৭২)*

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) হলেন, সেই সাহাবী যাকে স্বপ্নে আযানের বাক্যাবলী অবহিত করা হয় আর তিনি মহানবী (সা.)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে সেই নির্দিষ্ট বাক্যে আযান দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যা হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) স্বপ্নে দেখেছিলেন। এটি ১ম হিজরী সনে মহানবী (সা.) কর্তৃক মসজিদে নববী নির্মাণের পরের ঘটনা। *(আলইসতিয়াব ফী মা'রেফাতিল আসহাব, খণ্ড: ০৩, পৃ: ৯১৩, আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ, দারুল জিল, বৈরুত থেকে ১৯৯২ সনে প্রকাশিত সংস্করণ)*

এই ঘটনার কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ হলো- (আনসারদের মধ্য থেকে) হযরত আবু উমায়ের বিন আনাস আনসারী (রা.) নিজ চাচাদের বরাতে বর্ণনা করেন যে, তারা বলেন, মহানবী (সা.) চিন্তা করছিলেন, নামাযের জন্য মানুষকে কীভাবে একত্রিত করা যায়? তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করা হয় যে, নামাযের সময় একটি পতাকা উত্তোলিত করা হোক, মানুষ সেটি দেখে পরস্পরকে অবহিত করবে। কিন্তু এই প্রস্তাব তিনি (সা.) পছন্দ করেন নি। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) এর কাছে সিঙ্গা-র কথা উল্লেখ করা হয়, অর্থাৎ ইহুদিদের ডাকার রীতি সম্পর্কে (বলা হয়) যাতে জোরে ফু দিয়ে শব্দ করা হয়। তিনি (সা.) এটিও পছন্দ করেন নি, কেননা এটি ইহুদিদের রীতি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁর (সা.) কাছে ঘন্টা বাজানোর উল্লেখ করা হয়। তিনি (সা.) বলেন, এটি খ্রিষ্টানদের রীতি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ ফিরে যান আর মহানবী (সা.)-এর চিন্তার কারণে তিনিও চিন্তিত ছিলেন। তিনি দোয়া করেন এবং বলেন যে, স্বপ্নে তাকে আযান দেখানো হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখি যার হাতে ঘন্টা ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কি এই ঘন্টা বিক্রি করবে। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি এটি দিয়ে কী করবে? আমি বললাম, এর মাধ্যমে আমরা নামাযের জন্য ডাকবো। সে বললো, আমি কি তোমাকে সেই কথা অবহিত করব যা এর চেয়ে উত্তম? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই। হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, তখন সে বলে তাহলে বল, আর আযানের বাক্যাবলী শুনায়,

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ

শিশু এবং নবমুসলিমদের জন্য এর অনুবাদও পড়ে দিচ্ছি, কেননা তা উপকারী হয়ে থাকে। আযান আমরা প্রতিদিনই শুনি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি দেখেছি অনেকেই এর অনুবাদ জানে না। অর্থ হলো- আল্লাহ্ সর্বমহান, আল্লাহ্ সর্বমহান, এটি চারবার বলতে হবে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই- এটি দুবার বলতে হবে। এরপর- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল- এটিও দুবার বলতে হবে। এরপর- নামাযের দিকে আস, **حَيَّ عَلَى اَلصَّلَاة** , নামাযের দিকে আস। **حَيَّ عَلَى اَلْفَلَاح** , সফলতার দিকে আস, সফলতার দিকে আস। আল্লাহ্ সর্বমহান- এটি দুবার বলতে হবে। এরপর- **لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰه** , আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

তিনি বলেন, এই শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির পর সেই ব্যক্তি আমার কাছ থেকে কিছুটা পিছনে সরে যায় এবং এরপর বলে, আর যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন এটি বল, এরপর তকবীরের বাক্যগুলো উচ্চারণ করে,

اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰه
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اَللّٰه حَيَّ عَلَى اَلصَّلَاة
حَيَّ عَلَى اَلْفَلَاح قد قامت الصلاة قد قامت
الصلاة اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰه

এতে আযানের চেয়ে কেবল দু'টি বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে- **قد قامت الصلاة** অর্থাৎ নামায দাঁড়িয়ে গেছে, নামায দাঁড়িয়ে গেছে। আর এরপর- আল্লাহ্ সর্বমহান, আল্লাহ্ সর্বমহান।

তিনি বলেন, সকাল হলে আমি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হই এবং যা স্বপ্নে দেখেছি তা বর্ণনা করি। তিনি (সা.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ চাইলে এটি সত্য স্বপ্ন, তুমি বেলালের সাথে দাঁড়িয়ে যাও আর তুমি যা দেখেছ তা বলতে থাক। তিনি এই বাক্যাবলীর মাধ্যমে আযান দিবেন কেননা তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে উঁচু। অতএব আমি বেলালের সাথে দাঁড়িয়ে যাই। আমি তাকে বলতে থাকি আর তিনি সে অনুসারে আযান দিতে থাকেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা.) যখন এই আযান শুনেন তখন তিনি নিজ গৃহে ছিলেন। তিনি নিজের চাদর টানতে টানতে বের হন এবং (তখন) বলছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তা-ই দেখেছি যা তিনি দেখেছেন। এটি শুনে তিনি (সা.) বলেন, সব প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র। *(সুনান আবি দাউদ, কিতাবুস্ সালাত, হাদীস: ৪৯৮, হাদীস: ৪৯৯)*

অপর একটি রেওয়ায়েতে এই স্থানে এই শব্দাবলী রয়েছে যে, তখন মহানবী (সা.) বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র আর এটিই সুদৃঢ়-সুনিশ্চিত কথা। (জামে তিরমিযি, কিতাবুস্ সালাত, হাদীস: ১৮৯)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে কিছু বর্ধিত কথাও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

"নামাযের জন্য যখন আযান দেয়ার বা ডাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না তখন সাহাবীরা সচরাচর সময়ের ধারণা করে নিজেরাই নামাযের জন্য সমবেত হয়ে যেতেন, কিন্তু এটি কোন স্বস্তিদায়ক পন্থা ছিল না। মসজিদে নববী নির্মিত হওয়ার পর এই প্রশ্নটি খুব বেশি অনুভূত হতে থাকে যে, মুসলমানদের কীভাবে সময়মতো একত্রিত করা যায়। কোন সাহাবী খ্রিষ্টানদের ন্যায় ঘন্টা বাজানোর পরামর্শ দেন। কেউ ইহুদিদের আদলে সিঙ্গা বাজানোর প্রস্তাব দেন। কেউ ভিন্ন কথা বলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) পরামর্শ দেন যে, নামাযের সময় কোন ব্যক্তিকে নামাযের সময় হয়ে গেছে বলে ঘোষণা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হোক। মহানবী (সা.) এই প্রস্তাবকে পছন্দ করেন এবং হযরত বেলাল (রা.)-কে এই দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেন [আযান নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে হযরত উমর (রা.)-এর একটি মতামত এটিই ছিল]। অতএব এরপর থেকে নামাযের সময় হলে হযরত বেলাল উচ্চস্বরে 'আসসালাতু জামেআতুন' বলে ঘোষণা করতেন আর মানুষ সমবেত হয়ে যেত। বরং নামায ছাড়াও যদি কোন কারণে মুসলমানদেরকে মসজিদে সমবেত করতে হতো তাহলে এভাবেই ডাকা হতো আর এই ঘোষণাই করা হতো। এর স্বল্পকাল পর (এরপর সেই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে,) এক সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী (রা.)-কে বর্তমান আযানের বাক্যাবলী শিখানো হয় আর তিনি মহানবী (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজের এই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে আযান হিসেবে এই বাক্যগুলো বলতে শুনেছি। তিনি (সা.) বলেন, এই স্বপ্ন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে এবং আব্দুল্লাহ্‌কে নির্দেশ দেন যেন তিনি বেলালকে এই শব্দগুলো শিখিয়ে দেন। তিনি লিখেন, আশ্চর্জজনক দৈব বিষয় যা ঘটেছে তা হলো- বেলাল (রা.) যখন এসব বাক্যে প্রথমবার আযান দেন তখন হযরত উমর (রা.) এটি শুনে তড়িঘড়ি করে মহানবী (সা.) এর কাছে

উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আজ বেলাল (রা.) যেসব বাক্যে আযান দিয়েছেন হুবহু একই বাক্যাবলী আমিও স্বপ্নে দেখেছি। অপর এক রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে যে, আযানের বাক্যাবলী শুনে মহানবী (সা.) বলেন, এ সম্পর্কেই ওহীও হয়েছে। *(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম. এ. সাহেব রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তক, পৃ: ২৭১-২৭২)*

বশীর বিন মুহাম্মদ নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.), যাকে স্বপ্নে আযান দেখানো হয়েছিল, তিনি তার সেই সম্পদ সদকা করেন যা ছাড়া তার কাছে আর কিছু ছিল না। অর্থাৎ পুরো সম্পদ সদকা করে দেন। তিনি (রা.) এবং তার পুত্র এই সম্পদের মাধ্যমে জীবন ধারণ করছিলেন। এটিই তাদের উপার্জনের মাধ্যম ছিল। অতএব যে সম্পদই ছিল, তিনি (রা.) সেই সম্পদ মহানবী (সা.) এর হাতে তুলে দেন। যখন তিনি উক্ত সম্পদ দান করে দেন তখন তার পিতা মহানবী (সা.) এর কাছে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) নিজের সম্পদ সদকা করেছেন অথচ তিনি এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদকে ডেকে বলেন, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা'লা তোমার কাছ থেকে তোমার সদকা গ্রহণ করেছেন। তুমি যা আল্লাহ্‌র খাতিরে দান করেছ তা তিনি গ্রহণ করেছেন। এখন তুমি তা উত্তরাধিকার হিসেবে তোমার পিতামাতাকে ফিরিয়ে দাও। বশীর বলেন, এরপর আমরা তা উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি। অর্থাৎ পরবর্তীতে তার সন্তানরা এভাবে তা থেকে অংশ পেয়েছে। (মা'রেফাতুস সাহাবা, লে আবি নুআয়েমুস সাবহানী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৯, আব্দুল্লাহ বিন যায়দ, হাদীস নং ৪১৭২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ বৈরুত ২০০২)

একবার মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদকে যায়েদ (রা.)-কে নিজের নখ তাবাররুক হিসেবে প্রদান করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের যায়েদ (রা.)-এ পুত্র মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, তার পিতা মহানবী (সা.) এর কাছে বিদায় হজ্জের সময় মিনা'র ময়দানে 'মানহার' অর্থাৎ কুরবানীর স্থানে কুরবানী করার সময় উপস্থিত ছিলেন আর তার সাথে আনসারদের মধ্য থেকে অপর এক ব্যক্তিও ছিলেন। মহানবী (সা.) কুরবানীসমূহ বণ্টন করলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) এবং তার আনসারী সাথি কিছুই পান নি। এরপর মহানবী (সা.) নিজের চুল কামিয়ে একটি কাপড়ে রাখেন আর সেগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেন। এরপর তিনি (সা.) তাঁর নখ কাটেন এবং সেগুলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী (রা.) এবং তার সাথিকে প্রদান করেন।

(তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৬ আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৯০)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! খোদার কসম, নিশ্চয় আপনি আমার কাছে আমার নিজ সত্তার চেয়েও প্রিয় এবং আপনি আমার কাছে আমার পরিবারের চেয়েও প্রিয়, আর আপনি আমার কাছে আমার সন্তানদের চেয়েও প্রিয়। আমি বাড়িতে ছিলাম আর আপনাকে স্মরণ করছিলাম। আমি ধৈর্য্য ধারণ করতে না পেরে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি আর এখন আমি আপনাকে দেখছি। যখন আমার নিজের ও আপনার মৃত্যুর কথা ভাবলাম তখন আমার মনে হলো যে, আপনি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন আপনাকে অপরাপর নবীদের সাথে উত্থিত করা হবে। আর আমি ভয় পাই যে, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করব তখন আপনাকে সেখানে পাব না। তখন মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তিকে কোন উত্তর দেন নি। এমনকি জিবরাঈল এই আয়াতসহ অবতীর্ণ হন যে,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ

(সূরা আন্ নিসা: ৭০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেছেন। অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(তফসির ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১১, সূরা নিসা ৬৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৯৮)*

এই আয়াতটিকে আমরা এই দলীল হিসেবেও উপস্থাপন করি যে, মহানবী (সা.) এর আনুগত্যের মাধ্যমে শরীয়ত বিহীন নবুয়ত লাভ হতে পারে। আর তাঁর (সা.) অনুসরণ করে এক ব্যক্তি সালেহীয়তের মর্যাদা থেকে উন্নতি করে নবুয়তের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। যাহোক নবুয়তের মর্যাদা, তা শরীয়ত বিহীন নবুয়তই হোক না কেন আর মহানবী (সা.) দাসত্বে হলেও এটি অনেক উচ্চ মর্যাদা, আর আল্লাহ্ তা'লা যাকে চান তা প্রদান করেন। এছাড়া আগমনকারী মসীহ্ মওউদ সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা.) নবীউল্লাহ্ শব্দ ব্যবহার করেছেন। *(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, বাব যিকরুদ্দাজ্জাল, হাদীস নং ২৯৩৭)*

এ কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমরা মহানবী (সা.) এর দাসত্বে শরীয়ত বিহীন নবী হিসেবে মানি। আর এতে মহানবী (সা.) এর খতমে নবুয়তের মর্যাদার কোন হানি হয় না, বরং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় কেননা এখন নবুয়তও কেবলমাত্র তাঁর (সা.) দাসত্বেই লাভ হতে পারে। আর এই অর্থ শুধু আমরাই করি না, বরং অতীতের বুযুর্গরাও করেছেন। অতএব ইমাম রাগেবও এর এই অর্থই করেছেন যে, মহানবী (সা.) এর পর তাঁর অনুবর্তীতায় শরীয়ত বিহীন নবী আসতে পারে। *(তফসির আল বাহরুল মুহিত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৯, আন নিসা: ৬৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০১০)*

যাহোক এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে এর উল্লেখ আমি এজন্য করলাম যেন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লামা যুরকানি লিখেছেন যে, বিভিন্ন তফসীর গ্রন্থে মহানবী (সা.) এর দাস হযরত সো'বান সম্পর্কে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, অথচ তফসীর 'ইয়াম্বুউল হায়াত'-এ মাকাতেল বিন সোলেমান সম্পর্কে লেখা আছে যে, তিনি ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ আনসারী (রা.), যিনি স্বপ্নে আযান দেখেছিলেন। আল্লামা যুরকানি লিখেন যে, যদি এই কথা সঠিক হয়ে থাকে তাহলে হতে পারে যে, উভয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে এমন কথার উল্লেখ করে থাকবে, যার ফলে এই আয়াত নাযেল হয়েছে। এছাড়া এটিও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, এমন কথা মহানবী (সা.) এর বেশ কয়েকজন সঙ্গী বলেছিলেন। *(শারহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিবিদ দুনিয়া, দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৭-৪১৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৯৬)*

প্রথমে বর্ণিত ঘটনা ছাড়া তফসীর ইত্যাদিতে হযরত সো'বান (রা.)-এর ঘটনা এবং শব্দাবলীও বর্ণিত হয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ হলো- হযরত সো'বান (রা.) মহানবী (সা.) প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। আর তাঁর (সা.) কাছ থেকে দূরে থাকা তিনি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারতেন না। একদিন তিনি যখন মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হন তখন তাকে ভিন্নরকম দেখাচ্ছিল আর তার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল স্পষ্ট। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, কী কারণে তোমাকে এমন দেখাচ্ছে? হযরত সো'বান নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এছাড়া আমার কোন রোগ নেই আর আমি কোন ব্যাধিতেও আক্রান্ত নই যে, আমি আপনাকে দেখতে পারি নি, অর্থাৎ তিনি কিছুকাল তাঁকে (সা.) দেখতে পান নি, এ কারণে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি যতক্ষণ না আপনার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। অনুরূপভাবে যখন পরকালের কথা আমার স্মরণ হয় তখন আমার ওপর পুনরায় ভীতি ছেয়ে যায় যে, আমি আপনাকে দেখতে পারব না কেননা আপনাকে তো নবীদের সাথে উত্থিত করা হবে। আর আমি যদি জান্নাতে যাইও তাহলেও আমার মর্যাদা আপনার মর্যাদা থেকে অনেক নিম্ন পর্যায়ের হবে। আর আমি যদি জান্নাতে প্রবেশ করতে না পারি তাহলে আমি কখনো আপনাকে দেখতে পারবো না। *(তাফসিরুল বাগবী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫০, আন নিসা: ৬৯, এদারায়ে তা'লিফাতে আশরাফিয়া, মুলতান, পাকিস্তান, ১২২৫ হিজরী)*

আল্লামা যুরকানি লিখেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজ বাগানে কর্মরত ছিলেন, এখানে পুনরায় আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের উল্লেখ আরম্ভ হচ্ছে, এমন সময় তার পুত্র তার কাছে আসেন এবং তাকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহুম্মাযহাব বাসরী হাত্তা লা আরা বা'দা হাবীবি মুহাম্মাদা আহাদা। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যাও, যেন আমি এরপর আমার প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া আর কাউকে না দেখি। যুরকানির ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, বলা হয় এরপর ক্রমাগতভাবে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে থাকে আর তিনি অন্ধ হয়ে যান। *(শারহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিবিদ দুনিয়া, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৯৬)*

আল্লামা যুরকানি লিখেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ নিজ বাগানে কর্মরত ছিলেন, এখানে পুনরায় আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের উল্লেখ আরম্ভ হচ্ছে, এমন সময় তার পুত্র তার কাছে আসেন এবং তাকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন তিনি বলেন, **আল্লাহুম্মাযহাব বাসরী হাত্তা লা আরা বা'দা হাবীবি মুহাম্মাদা আহাদা**। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যাও, যেন আমি এরপর আমার প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া আর কাউকে না দেখি। যুরকানির ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, বলা হয় এরপর ক্রমাগতভাবে তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে থাকে আর তিনি অন্ধ হয়ে যান।

তার মৃত্যু সম্পর্কে লেখা আছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদের (রা.)-এর মৃত্যুর সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ ওহুদের যুদ্ধের পর তার মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এটি উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। আর হযরত উসমানের (রা.)-এর খিলাফতের শেষ দিকে ৩২ হিজরীতে মদিনায় তার ইন্তেকাল হয়েছে। আর তার দৃষ্টি সংক্রান্ত ঘটনাকেও যদি সঠিক মনে করা হয়, তা থেকেও বুঝা যায় যে, হযরত উসমানের (রা.)-এর যুগেই তার ইন্তেকাল হয়েছে। তখন তার বয়স ছিল ৬৪ বছর। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযা পড়িয়েছেন। *(আল মুসতাদকে আলাস সাহিহাইন লিল হাকেম, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৬, কিতুবুল ফারয়েজ, হাদীস নং: ৮১৮৭, দারুল ফিকর্ ২০০১) (তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৬ আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৯০)*

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.)। হযরত মুআয বিন আমর (রা.) বনু খাযরাজ গোত্রের বনু সালমা শাখার সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আত আর বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার পিতা আমর বিন জমুহ্ (রা.) মহানবী (সা.) এর সাহাবী ছিলেন, যিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। তার মায়ের নাম ছিল হিন্দ বিনতে আমর। মুসা বিন উকবা,

আবু মা'শার এবং মুহাম্মদ ওয়াকদি'র মতে তার ভাই মুআভেয বিন আমরও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আর তার স্ত্রীর নাম ছিল সুবায়তা বিনতে আমর (রা.), যিনি বনু খাযরাজের বনু সায়েদা শাখার সদস্যা ছিলেন। তার ঘরে তার এক পুত্র আব্দুল্লাহ্ এবং এক কন্যা উমামা জন্মগ্রহণ করেন। *(তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৬-৪২৭ মুআয বিন আমর, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৯০) (সীরাতুন নববিয়্যাহ লিইবনে কাসির, পৃষ্ঠা ১৯৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০৫)*

হযরত মুআয (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে যোগদান করেছিলেন কিন্তু তার পিতা আমর বিন জমুহ্ তার পৌত্তলিক বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সীরাত ইবনে হিশামে হযরত মুআয (রা.)-এর পিতার ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত ঘটনায় উল্লিখিত আছে। বছরকাল পূর্বে তার ঘটনায় এটি আমিও তার ঘটনা কিছুটা উল্লেখ করেছিলাম যে, আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণকারীরা যখন মদিনায় ফিরে আসে তখন তারা ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। কিন্তু তাদের কতক জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ তখনও নিজেদের পৌত্তলিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের মাঝে একজন ছিল আমর বিন জমুহ্ (রা.)। তার (রা.) পুত্র মুআয বিন আমর (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর তখন তিনি মহানবী (সা.) এর হাতে তিনি বয়আত করেছিলেন। আমর বিন জমুহ্ (রা.) বনি সালামার সর্দারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাদের জ্যেষ্ঠদের একজন ছিলেন। তিনি তার ঘরে একটি কাঠের মূর্তি বানিয়ে রেখেছিলেন, যেভাবে সে যুগের বড়লোকেরা প্রভাবশালীরা তৈরী করে বানিয়ে রাখতো। এটিকে 'মানাত' বলা হতো। সেটিকে উপাস্য হিসেবে সেটিকে অবলম্বন করে তার মাহাত্ম্য এবং পবিত্রতা ঘোষণা করা হতো। বনু সালমার কিছু যুবক যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তারা যুবকের ইসলাম গ্রহণের পর, যাদের মাঝে হযরত মুআয বিন জাবাল এবং আমর বিন জমুহ্‌র পুত্র মুআয বিন আমর বিন জমুহ্‌ও ছিলেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আকাবার দ্বিতীয় বয়আতেও অংশগ্রহণ করেছেন, তারা রাতের বেলা আমর বিন জমুহ্‌র দেবালয়ে ঢুকে সেই মূর্তিকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন আর সেটিকে বনু সালমার ময়লা আবর্জনার গর্তে উপুড় করে শুইয়ে দেন বা ফেলে দেন। এই যুবকদের মাঝে হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) এবং আমর বিন জমুহ্‌র পুত্র মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.)ও ছিলেন। এরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর আকাবার দ্বিতীয় বয়আতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমর যখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতেন তখন বলতেন, তোমাদের অমঙ্গল হোক। কে রাতের বেলা আমাদের উপাস্যদের সাথে কে শত্রুতা করেছে? এরপর সেটিকে সন্ধানের উদ্দেশ্যে বের হতেন এবং তা যখন আবর্জনার গর্তে পেতেন তখন সেটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। এরপর বলতেন, আমি যদি এটি জানতে পারি যে, তোমার সাথে এমন দুর্ব্যবহার কে করেছে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত করব। এরপর আবার রাত নেমে আসলে আমর যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখন তার পুত্র একই কাজ করতেন। পুনরায় সকালে উঠে আমর বিন জমুহ্ একই কষ্ট সহ্য করে সেটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। বেশ কয়েক রাত এই ঘটনা ঘটার পর আমর বিন জমুহ্ প্রতিমাকে যেখানে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেখান থেকে বের করে পুনরায় সেটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করেন। এরপর তিনি নিজের তরবারি আনেন এবং প্রতিমার কাঁধে ঝুলিয়ে দেন এবং বলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি না কে তোমার সাথে এমন করে। অতএব তোমার মাঝে যদি কোন শক্তি থাকে তাহলে তাকে বাধা দাও আর এই তরবারি তোমার কাছে রইল, অর্থাৎ তরবারি সেটির কাছে রেখে দেন। সন্ধ্যাবেলা আমর যখন ঘুমিয়ে পড়েন, সেই যুবকরা, যাদের মাঝে আমরের পুত্রও ছিল, সেই প্রতিমার সাথে আবার একই ব্যবহার করে আর এক মৃত কুকুর এনে রশি দিয়ে সেটিকে মূর্তির সাথে বেঁধে দেয় এবং বনু সালমার একটি পুরোনো কূপে সেটিকে ফেলে দেয় যাতে ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি ফেলা হতো। সকালবেলা আমর বিন জুমহ্ উঠে সেই প্রতিমাকে সেখানে পাননি যেখানে সেটিকে রাখা হতো। তিনি সেটির সন্ধান করতে থাকেন এবং সেটিকে কূপের ভিতর মৃত কুকুরের সাথে বাঁধা অবস্থায় পান। এই দৃশ্য দেখার পর তার সামনে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর তার জাতির মুসলমানরাও ইসলাম সম্পর্কে তাকে অবহিত করলে তিনি আল্লাহ্‌র কৃপায় ইসলাম গ্রহণ করেন। *(আস সীরাতুন্নাবুবীয়া, ইবনে হিশাম, পৃ. ২০৭-২০৮, ২০০৯ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

সীরাত ইবনে হিশাম-এ এই ঘটনা এভাবেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ এই প্রতিমা তো তরবারি থাকা সত্ত্বেও কিছুই করতে পারে নি, এমন খোদার পূজা বা উপাসনা করে লাভ কি!

হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.) আবু জাহলকে হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বুখারীর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, সালেহ্ বিন ইব্রাহীম তার দাদা হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, আমি বদরের যুদ্ধের সারিতে দণ্ডায়মান ছিলাম। আমি আমার ডানে ও বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দু'জন স্বল্পবয়স্ক আনসার কিশোরকে দেখতে পাই। তিনি বাসনা ব্যক্ত করেন যে, হায়! আমি যদি এমন লোকদের মাঝে থাকতাম যারা এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী দেহের অধিকারী টগবগে যুবক। ততক্ষণে তাদের একজন আমার হাতে চাপ দিয়ে বলে যে, চাচা, আপনি কি আবু জাহলকে চেনেন? আমি বললাম হ্যা, কিন্তু ভাতিজা, তার সাথে তোমার কী? সে উত্তর দেয়, আমাকে বলা হয়েছে যে, সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গালি দেয় আর সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি যদি তাকে দেখতে পাই

তাহলে আমার চোখ ততক্ষণ তার চোখ থেকে সরবে না যতক্ষণ আমাদের দু'জনের মাঝে সে নিহত না হবে, যার মৃত্যুর সময় পূর্বে নির্ধারিত। আমি এতে খুবই আশ্চর্যান্বিত হই। এরপর দ্বিতীয় জনও আমার হাতে চাপ দেয় আর সে-ও একইভাবে প্রশ্ন করে। স্বল্পক্ষণ পরেই আমি আবু জাহলকে মানুষের মাঝে ঘোরাফেরা করতে দেখি। আমি বললাম, ঐ হলো তোমাদের সাথি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করেছ। এ কথা শুনতেই তারা উভয়ে নিজেদের তরবারি নিয়ে তার দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায় আর তাকে আক্রমণ করে উভয়েই তাকে হত্যা করে। এরপর তারা উভয়েই মহানবী (সা.) এর কাছে ফিরে আসে এবং তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মাঝে কে তাকে হত্যা করেছে। তাদের উভয়ে বলেন, আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে পরিষ্কার করে ফেলেছ? তারা উত্তর দেন যে, না। তিনি (সা.) তরবারি দেখে বলেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। তার গনিমতের মাল মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.) পাবেন আর তাদের উভয়ের নাম ছিল মুআয। অর্থাৎ মুআয বিন আফরা (রা.) এবং মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.)। *(সহীহ বুখারী, কিতাবু ফারাযুল খামসি বাব মাল্লাম ইয়াখমিসুল আসলাব, হাদীস ৩১৪১)*

আমি প্রারম্ভেও একবার মুআয এবং মুআভভায এর ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। এখানে কিছুটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে তাই বলছি যে, এই নিহত হওয়ার ঘটনা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে আর এই রেওয়ায়েত যা বুখারী থেকে বর্ণিত হয়েছে তাতে উল্লেখ আছে যে, হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.) এবং মুআয বিন আফরা (রা.) আক্রমণ করে আবু জাহলকে হত্যা করেছিলেন আর হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) আবু জাহলের শিরোচ্ছেদ করেছিলেন। অন্য স্থানে মুআয এবং মুআভভায এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া বুখারীতেই এমন রেওয়ায়েত রয়েছে যাতে উল্লেখ আছে যে, আফরা-র দুই পুত্র মুআয এবং মুআভভায আবু জাহলে তাকে হত্যা করেছেন। আর পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) গিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন। বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে:

মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন বলেছেন, **আবু জাহল সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য কে যাবে?** হযরত ইবনে মাসুদ (রা.) যান এবং গিয়ে দেখেন যে, তাকে আফরা-র দুই পুত্র মুআয এবং মুআভভায তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে, যার কারণে সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ছিল। হযরত ইবনে মাসুদ (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আবু জাহল? হযরত ইবনে মাসুদ (রা.) বলেন, আমি আবু জাহলের দাড়ি ধরি। আবু জাহল বলে যে, আমার চেয়েও বড় কোন ব্যক্তি আছে কি যাকে তোমরা মেরেছ? অথবা বলে যে, এই ব্যক্তির চেয়ে বড় কেউ আছে কি যাকে তার জাতি মেরে থাকবে?

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন বলেছেন, আবু জাহল সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য কে যাবে? হযরত ইবনে মাসুদ (রা.) যান এবং গিয়ে দেখেন যে, তাকে আফরা-র দুই পুত্র মুআয এবং মুআভভায তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে, যার কারণে সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ছিল। হযরত ইবনে মাসুদ (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আবু জাহল? হযরত ইবনে মাসুদ (রা.) বলেন, আমি আবু জাহলের দাড়ি ধরি। আবু জাহল বলে যে, আমার চেয়েও বড় কোন ব্যক্তি আছে কি যাকে তোমরা মেরেছ? অথবা বলে যে, এই ব্যক্তির চেয়ে বড় কেউ আছে কি যাকে তার জাতি মেরে থাকবে? *(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব কাতাল আবি জাহল, হাদীস ৩৯৬২)*

এই উভয় রেওয়ায়েত বুখারীতেই রয়েছে। এক জায়গায় উভয় নামই মুআয বর্ণিত হয়েছে, আরেক জায়গায় মুআয এবং মুআভভায বর্ণিত হয়েছে। এক স্থানে উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন পিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে আরেক স্থানে উভয়েই একই পিতার পুত্র আখ্যায়িত হন। হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) আবু জাহলের হত্যাকারীদের বিষয়ে রেওয়ায়েতের মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে এবং ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে, আফরার দুই পুত্র (মুয়াভ্ভায ও মুয়ায) আবু জাহলকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে হাজ্র এই সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন যে, মুয়ায বিন আমর (রা.) এবং মুয়ায বিন আফরা (রা.)-এর পর মুয়াভ্ভায বিন আফরা (রা.)-ও তার ওপর আঘাত হেনে থাকবেন। *(সহীহ্ বুখারী ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৯১ পাদটিকা, প্রকাশনা বিভাগ রাবওয়া কর্তৃক অনূদিত)*

তাই প্রথম দুই রেওয়ায়েতে উভয় ভাইয়ের উল্লেখও পাওয়া যায়। আর অন্য রেওয়ায়েতে দু'জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর বুখারীর তফসীর ফাতহুল বারী-তে লেখা আছে, এদের তিনজনেরই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লামা বদরউদ্দিন আইনি আবু জাহলের হত্যাকারী সংক্রান্ত কথাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্যতা খুঁজতে গিয়ে বলেন, আবু জাহলকে মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.) আর মুআয বিন আফরা (রা.) এবং হযরত

আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) হত্যা করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ তার শিরোচ্ছেদ করেন এবং মহানবী (সা.) এর কাছে নিয়ে আসেন। *(উমদাতুল কারী, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১২০, ২০০৩ সনে বৈরুত থেকে মুদ্রিত)*

আল্লামা বদরউদ্দিন আইনি আরো লিখেন, সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবু জাহলকে যে দুজন হত্যা করেছেন তারা হলেন, মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.) এবং মুআয বিন আফরা (রা.)। মুআয বিন আফরা (রা.)-এর পিতার নাম ছিল হারেস বিন রিফাআ আর আফরা ছিলেন তার মা, যিনি উবায়েদ বিন সা'লাবা নাজ্জারিয়া-র কন্যা ছিলেন। একইভাবে বুখারীর জিহাদ অধ্যায়ে বাব 'মাল্লাম ইয়ুখাম্মেসিল আসলাব'-এ উল্লেখ রয়েছে, হযরত মুআয বিন আমরই আবু জাহলের পা কেটে ফেলেন এবং তাকে ফেলে দেন। এরপর মুআভ্‌ভায বিন আফরা তাকে আঘাত করেন এবং ভূপাতিত করেন আর তাকে ছেড়ে দেন। তার মাঝে তখনও জীবনের স্পন্দন ছিল। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ মোক্ষম আঘাত হেনে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তিনি আরো লিখেন, তুমি যদি প্রশ্ন কর, এসব কথা একত্রে বর্ণনা করার প্রয়োজন কী? তাহলে আমি বলবো, আবু জাহলের হত্যায় সম্ভবত এদের সবার ভূমিকা ছিল তাই একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। *(উমদাতুল কারী, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১২১-১২২, ২০০৩ সনে বৈরুত থেকে মুদ্রিত)*

যুরকানি-র একটি বর্ণনা অনুসারে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ আবু জাহলকে এমন অবস্থায় পেয়েছেন যখন সে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ছিল। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) তার পা আবু জাহলের ঘাড়ে রেখে বলেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। তখন আবু জাহল অহংকারসূচক ভঙ্গিতে বলে, আমি তো লাঞ্ছিত হই নি! আমার চেয়ে সম্মানিত কাউকে তোমরা হত্যা করেছ কি? অর্থাৎ আমি তো এতে কোন লজ্জাবোধ করছি না। এরপর আবু জাহল জিজ্ঞেস করল, বল তো দেখি যুদ্ধে কে জয়যুক্ত হয়েছে, বিজয় ও সাফল্য কার পদচুম্বন করেছে? তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ উত্তর দেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) বিজয়ী হয়েছেন।

আরেকটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, আবু জাহল বলল, তাকে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলে দিও, আমি সারাজীবন তার শত্রু ছিলাম আর আজ অর্থাৎ এখনও আমি তার প্রতি চরম শত্রুতা ও বৈরিতা পোষণ করি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) আবু জাহল এর শিরোচ্ছেদ করেন আর তার মস্তক নিয়ে তিনি যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন তখন মহানবী (সা.) বলেন, যেভাবে আমি আল্লাহ্‌র সন্নিধানে সকল নবীর চেয়ে বেশি সম্মানিত ও মর্যাদাবান আর আমার উম্মত আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অন্য সকল উম্মতের চেয়ে বেশি সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী, অনুরূপভাবে এই উম্মতের ফেরাউন অন্য সকল উম্মতের ফেরাউনদের চেয়ে বেশি কঠোর ও উগ্র। এর কারণ হলো,

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ

(ইউনুস: ৯১)

পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনুসে আছে, যখন (পানি) তাকে নিমজ্জিত করতে আরম্ভ করলো, তখন সে বললো, আমি ঈমান আনছি যে, "কেবল তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই যার প্রতি বণী ইস্রাঈল ঈমান এনেছে।" যদিও পক্ষান্তরে এই উম্মতের ফেরাউন শত্রুতা এবং কুফরীতে অনেক এগিয়ে আছে, যেমন- মৃত্যুর সময় আবু জাহলের কথা থেকেও এটি প্রতীয়মান হয়। এছাড়া অন্যান্য রেওয়ায়েতে একথার উল্লেখও পাওয়া যায় যে, আবু জাহলের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) আবু জাহলের (কর্তিত) মস্তক দেখে বললেন, اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ *(সূরা আল্ হাশর: ২৩)* অর্থাৎ "আল্লাহ্ সেই সত্তা, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই।" একইভাবে তিনি (সা.) তিনবার এটিও বললেন, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আআয্‌যাল ইসলামা ওয়া আহলাহু।" অর্থাৎ সকল প্রশংসার অধিকারী হলেন আল্লাহ্, যিনি ইসলাম ও এর অনুসারীদের সম্মান দিয়েছেন। অনুরূপভাবে এ উল্লেখও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মতের একজন ফেরাউন থাকে আর এই উম্মতের ফেরাউন ছিল আবু জাহল; যাকে আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত লজ্জ্যকরভাবে ধ্বংস করিয়েছেন। *(শারাহ্ আয্-যুরকানী আলাল মাওহিবিল লাদুন্নিয়্যা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭-২৯৮, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। *(আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস্ সাহাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১৪) মুআয বিন আমর বিন জমুহ্, ১৯৯৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

খলীফা বিন খায়্যাত বর্ণনা করেন, বদরের (যুদ্ধের) দিন মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ (রা.)-এর (দেহে) একটি আঘাত লেগেছিল এরপর তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। অবশেষে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযা পড়েন এবং তিনি জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, "মুআয বিন আমর বিন জমুহ্ কতইনা উত্তম একজন মানুষ"। *(আল-মুস্তাদরাক আলাস্ সাহীহাইন লিলহাকেম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪০-১৪১, যিকরু মানাকিবি মুআয বিন আমর আল-জমুহ্ হাদীস-৫৮৯৫-৫৮৯৭, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

আল্লাহ্ তা'লা এসব লোকের ওপর সহস্র সহস্র রহমত ও কৃপা বর্ষণ করুন, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয় রসূলের ভালোবাসায় বিভোর হয়ে তাদের প্রিয়ভাজন হয়েছেন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযাও পড়াবো, এটি হলো শ্রদ্ধেয় মালেক সুলতান হারূন খান সাহেবের জানাযা। ২৭শে মার্চ ইসলামাবাদে তার মৃত্যু হয়েছিল إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তার বড় পুত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জামাতা, অর্থাৎ তাঁর ছোট মেয়ের সাথে তার বিয়ে হয়েছে। মালেক সুলতান হারূন সাহেব জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল কর্ণেল মালেক সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেব, যিনি ১৯২৩ সনে ২৩ বছর বয়সে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন আর নিজ পরিবারে একমাত্র আহমদী ছিলেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'ই তার বিয়ে চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেবের কন্যা শ্রদ্ধেয়া আয়েশা সিদ্দিকার সাথে করান। এই পরিবারটি ছিল পাঞ্জাবের সম্ভ্রান্ত বংশ এবং নবাব পরিবারগুলোর অন্যতম। মালেক আমীর মুহাম্মদ খান সাহেব, যিনি পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন এবং নবাব কালা বাগ নামে সুপরিচিত ছিলেন, তিনি কর্ণেল মালেক সুলতান মুহাম্মদ সাহেবের পিতার চাচাতো ভাই ছিলেন। তার দাদার নাম ছিল মালেক সুলতান সরখরু খান। সে সময় বৃটিশ রাজত্ব ছিল। তখন ভারত ও পাকিস্তান তাদের উপনিবেশ ছিল। সেসময় নবাব হিসেবে তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদাও ছিল। তার পুত্র মালেক সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেবের চার বছর পর আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। দুনিয়াদার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও পুণ্যাত্মা ও সৎপ্রকৃতি থাকায় ধর্মের প্রতি আকর্ষণ জন্মে আর আল্লাহ্ তা'লা সেই পুণ্যের কল্যাণে তাকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করেন। চৌধুরী আব্দুল হামীদ সাহেব, যিনি ওয়াপদায় জিএম হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তার কন্যার সাথে সুলতান হারুন খান সাহেবের বিয়ে হয়। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার বিয়ে পড়িয়েছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) নিকাহ্‌র এলান করার সময় একথাও বলেছিলেন যে, চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সিয়াল সাহেব, যিনি ইংল্যাণ্ড মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ও প্রথম মুবাল্লেগ ছিলেন, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজন ছিলেন, আমার প্রতি তার অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, আমার অল্প বয়সে এবং অভিজ্ঞতাশূন্য বয়সে তিনি আমাকে নিজের সাথে নিয়ে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতাকে ব্যাপকতর করার অনেক সুযোগ সৃষ্টি করেছেন আর গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীদের জন্য আমার হৃদয়ে যে প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ ছিল সেই আকর্ষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর সুযোগও চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সিয়াল সাহেবের সাথে থাকার কারণেই আমি লাভ করেছি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, আমার অল্প বয়সে এবং অভিজ্ঞতাশূন্য বয়সে তিনি আমাকে নিজের সাথে নিয়ে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতাকে ব্যাপকতর করার অনেক সুযোগ সৃষ্টি করেছেন আর গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীদের জন্য আমার হৃদয়ে যে প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ ছিল সেই আকর্ষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর সুযোগও চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সিয়াল সাহেবের সাথে থাকার কারণেই আমি লাভ করেছি।

একথাগুলো হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলছেন। তিনি (রাহে.) বলেন, এখনো আমি গ্রামের একজন সাধারণ মানুষের সাথে সাক্ষাতের সময় তার সাথে অকৃত্রিমভাবে কথা বলতে যে আনন্দবোধ করি তা আমি এক শহরবাসীর সাথে সাক্ষাতে অনুভব করি না। কেননা শহরের লোকদের কৃত্রিমতার অভ্যাস থাকে আর তাদের এই অভ্যাসের কারণে তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় আমরাও নিজের অজান্তেই কৃত্রিমতার আশ্রয় নেই। তিনি বলেন, যাহোক আজ আমার এই অনুগ্রহকারী গুরুজনের দৌহিত্র মালেক সুলতান হারূন খানের বিয়ে যার পিতা হলেন কর্ণেল সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেব। আমি তার নিকাহ্‌র এলান করব। এরপর তিনি বলেন, বন্ধুরা দোয়া করুন– আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা যেভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে খোদার ধর্মের সেবা করেছেন সেই একই সেবার প্রেরণা এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার চেতনা যেন তার পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও বজায় থাকে আর তা যেন উল্লেখযোগ্য হয়। *(খুতবাতে নাসের, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৭, ৪৪০)*

আজ তার মৃত্যুতে এ ঘটনার স্মৃতিচারণ হলো। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া থাকবে মরহুম মালেক হারুন সাহেবের সন্তানসন্ততিও যেন আহমদীয়াত এবং খিলাফতের সাথে গড়া সেই সম্পর্ককে শুধু প্রতিষ্ঠিতই না রাখে বরং যেন আরো সুদৃঢ় করে। তার তিন পুত্র ও তিন কন্যা রয়েছে। যেমনটি আমি বলেছি, (মরহুমের) বড় ছেলে সুলতান মুহাম্মদ খান হলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র জামাতা।

অত্র এলাকার দরিদ্র জনসাধারণ, বিশেষ করে অভাবী মহিলাদের অনেক সেবা করতেন আর তাদের প্রতি তার আচরণ ছিল খুবই নম্র। মহিলারা বলেছে যে, মালেক সাহেবের জীবদ্দশায় অত্র এলাকায় আমরা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করতাম। কিন্তু এখন তার তিরোধানের পর আমাদের ভয় হচ্ছে। আটক অঞ্চলে শত্রুতাও চরম আর পাষণ্ডতাও অনেক বেশি। দরিদ্রদের কোন অধিকারই দেয়া হয় না। কিন্তু অনেক বড় গৃহস্থ এবং এলাকার সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি দরিদ্রদের অনেক সেবা করতেন।

তার কানাডা নিবাসী বোন রাশেদা সিয়াল সাহেবা বলেন, আমার ভাই সুলতান হারুন খান সাহেব বহু গুণের আধার ছিলেন। আহমদীয়াতের জন্য তিনি পরম

আত্মাভিমান রাখতেন এবং খিলাফতের খাতিরে প্রাণ বিসর্জনকারী, বন্ধুদের সত্যিকার বন্ধু আর শত্রুদের প্রতি ছিলেন কঠোর। দরিদ্র এবং সহায় সম্বলহীন মানুষের অবলম্বন ছিলেন। তিনি বলেন, একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমাকে একটি পত্রে লিখেছেন যে, তোমার পিতা (কর্ণেল সুলতান মাহমুদ খান সাহেব) আহমদীয়াতের জন্য একটি নগ্ন তরবারি ছিলেন আর তোমার ভাইদের মধ্যেও একই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) একবার তাকে বলেছিলেন, অত্র অঞ্চলে তাদের চরম শত্রুতা ছিল। এসব অঞ্চলের শত্রুতার ধরণও সাধারণত এমনই হয়ে থাকে। কিছু জায়গা-জমির কারণেও শত্রুতা হয়ে থাকে, এছাড়া আহমদীয়াতের কারণেও শত্রুতা ছিল, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে বলেছিলেন, গুলি বর্ষিত হলেও তা (মাথার) ওপর দিয়ে চলে যাবে, ইনশাআল্লাহ্ তোমার কিছুই হবে না। তিনি (অর্থাৎ মরহুমের বোন) লিখেন, খলীফা সালেস (রাহে.)-এর এই কথা আমরা পূর্ণ হতে দেখেছি। ১৯৭৭ সনে ফতেহ্ জঙ্গ পুলিশ স্টেশনে তার ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয় আর মালেক সুলতান হারুন সাহেবের ওপর গুলি চলে এবং মাথার চুল ঝলশে দিয়ে তা চলে যায় কিন্তু তার (দেহে) সামান্য আঁচড়ও লাগে নি। আল্লাহ্ তা'লা অলৌকিকভাবে তাকে রক্ষা করেন। দরিদ্র এবং সহায় সম্বলহীন মানুষের প্রতি তিনি অনেক উদার ছিলেন। তিনি (অর্থাৎ মরহুমের বোন) আরো লিখেন, দুর্বল ও অসহায় মানুষের জন্য তিনি অবলম্বন ছিলেন।

তার বড় ভাই মালেক সুলতান রশীদ খান সাহেব বলেন, আমাদের পিতার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারের সত্যিকার আসল কর্তা তিনিই ছিলেন। আমার সকল চেষ্টা সত্ত্বেও যখনই জামা'তের কোন কাজ হতো, তিনি সর্বদা অধমের চেয়ে অগ্রগামী থাকতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), সম্মানিত খলীফাগণ এবং জামা'তের সত্যিকার নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ছিলেন। ১৯৭৪ সনের ঘটনাবলীর পর একবার আমার সামনে একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাকে বলেন, আপনাদের হযরত সাহেবের ওপর আপনার ঈমানের অবস্থা কেমন বলে মনে করেন? তখন তিনি পাঞ্জাবীতে উত্তর দেন, 'লোহে ওয়ারগা' অর্থাৎ খিলাফতের প্রতি আমার বিশ্বাস লোহার ন্যায় দৃঢ়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর হিজরতের সফরে তিনি করাচী পর্যন্ত সহযাত্রী ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গী হওয়ার সুযোগ হয়। রশীদ সাহেব লিখেন, আমার কাছে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র যেসব চিঠিপত্র সংরক্ষিত আছে সেগুলোর একটি পত্রে হুযূর অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে 'আহমদীয়াতের জেনারেল' এবং আরেক স্থানে 'আহমদীয়াতের জন্য ভালোবাসা ও আত্মাভিমানের ক্ষেত্রে নগ্ন তরবারি' আখ্যা দিয়েছেন। রাতের নফল ইবাদত ও পবিত্র কুরআনের সাথে যতটা সম্পর্ক রয়েছে (সে সম্পর্কে) রশীদ সাহেব লিখেন, অনেক কম মানুষই এ সম্পর্কে জেনে থাকবে। কেননা ঘুণাক্ষরেও তিনি এর উল্লেখ করতেন না কিন্তু উভয় দায়িত্বই তিনি নিয়মিতভাবে পালন করতেন। তার বড় ভাই লিখেন, ২০১৬ সনে আমার গুরুতর অসুস্থতার সময় আমরা দু'জন যদি চারমাস পর্যন্ত একই কক্ষে একসাথে না থাকতাম তাহলে হয়ত আমিও জানতে পারতাম না। সে দিনগুলোতে আমার জন্য ওঠাবসা কষ্টকর ছিল। উনি আমার সেবা-শুশ্রূষার জন্য একই কক্ষে আমার সাথে থাকতেন, তখন আমি তাকে নিয়মিত নফল পড়তে ও কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছি তা প্রশংসার যোগ্য ছিল। তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, আপনি যে কষ্ট করছেন তার চেয়ে আমার জন্য কোন একজন সেবক রাখলেই তো হতো, সে আমার সেবা করতে পারত। তখন তিনি বলেন, আমি যখন আপনার কাছে উপস্থিত আছি তখন আবার কাজের লোকের কি প্রয়োজন।

এরপর রশীদ সাহেব লিখেন, তিনি পরম মানবহিতৈষী মানুষ ছিলেন। ৯/১০টি স্কুল নির্মাণ করিয়েছেন। কখনো এমন সময়ও এসেছে যখন আয়-উপার্জন বেশি একটা হয় নি তাই স্কুলের জন্য (সাহায্য) দিতে পারেন নি। এমন অবস্থায় তিনি নিজে একবার শ্রমিকদের সাথে শ্রমিকের কাজও করেন আর শ্রমিকদের বলেন, তোমাদের চেয়ে আমি বেশি কাজ করি। এমন কোন ভাব ছিল না যে, আমি কোন নবাবের পুত্র বা অত্র অঞ্চলের বড় জমিদার।

তার কন্যা মাহমুদা সুলতানা কাশেফ লিখেন, খিলাফতের প্রতি আমার আব্বাজানের ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা কোন গোপন বিষয় নয়। বোধ-বুদ্ধির বয়স হতেই আমার পিতার কাছ থেকে উঠতে-বসতে যে শিক্ষা পেয়েছি তা হলো, খোদা তা'লার ওপর সর্বদা আস্থা রাখবে আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে কাজ করবে, দোয়া না থাকলে কিছুই নেই। খোদা তা'লার প্রতি তিনি চরম আস্থাবান ছিলেন। খুবই সাহসী ও নির্ভিক মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কাউকেই ভয় করতেন না। তিনি মানবসেবায় নিবেদিত ছিলেন।

একইভাবে তার পুত্র সুলতান মুহাম্মদ খান বলেন, আমার পিতা অনেক সামাজ সেবার করেছেন। ৮টি স্কুল নির্মাণ করিয়েছেন। ২টি কবরস্থানের জন্য জমি দিয়েছেন এবং ৮টি স্কুলের জন্য জমিও দিয়েছেন। অনেক দরিদ্র মানুষের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন আর তার সন্তানসন্ততিকেও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন আর জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি জানাযা পড়াব।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা

মাওলানা সাব্বির আহমদ, মুরুব্বি সিলসিলাহ্

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জনের উপায় মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালবাসা

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর শান সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই তা হল, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহবিব কুমুল্লাহ্। ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম। ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহীম। অর্থ: আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, "তুমি বল! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ্‌ও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন।"

হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, "আমি সত্য সত্যই বলছি। কোন ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে পুণ্যবান ও খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী বলে চিহ্নিত হতে পারবে না এবং উন্নত স্তরের পবিত্রাত্মারা যে সকল নেয়ামত, বরকত, মারেফাত, হাকিকাত, কাশফ বা দিব্যদৃষ্টি লাভ করে থাকে তার অধিকারী হতে পারবে না, যদি না সে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন হয়ে যায়।"

এই বিষয়টির আলোকে সর্বপ্রথম আমি আলোচনা করতে চাই সাহাবাগণ মুহাম্মদ (সা.) কে কী পরিমাণ ভালবাসতেন? তাঁর আনুগত্যে তারা কিভাবে জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত থাকতেন? আর এর মাধ্যমেও মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদার আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা শ্রেষ্ঠ তো তিনিই যার জন্য মানুষ জান, প্রাণ, সম্পদ কুরবানী করতে সামান্য দ্বিধাবোধ করে না।

● বদরের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.) সাহাবগণের হৃদয়ের অবস্থা পরখের জন্য বার বার পরামর্শ চাচ্ছিলেন, তখন এক আনসার সর্দার হযরত মেকদার বিন আমক মহানবী (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমরা মূসা (আ.)-এর সঙ্গীদের ন্যায় আপনাকে কখনই বলব না যে, তুমি আর তোমার প্রভু যাও এবং শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক। আমরা এখানেই বসে থাকব। বরং আমরা আপনার ডানে যুদ্ধ করব, আপনার বামে যুদ্ধ করব, আপনার সামনে যুদ্ধ করব, আপনার পেছনে যুদ্ধ করব। আর হ্যা আল্লাহ্‌র রসুল! যে শত্রুদল আপনার ক্ষতি সাধন করতে এসেছে তারা আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা আমাদের লাশের উপর দিয়ে যাবে। হে আল্লাহ্‌র রসুল! যুদ্ধ তো একটি মামুলি ব্যাপার। এখান থেকে কিছু দূরেই সমুদ্র। আপনি যদি হুকুম দেন তোমরা তোমাদের ঘোড়া নিয়ে সেই সমুদ্রে ঝাপ দাও। আমরা তৎক্ষণাৎ ঘোড়া নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ব।"

● উহুদের যুদ্ধে হযরত তালহা (রা.) সহ অন্যান্য সাহাবাগণ মুহাম্মদ (সা.)-কে বাঁচানোর জন্য নিজেদের জীবন বাজি ধরেছিলেন। আর যুদ্ধ শেষে যখন ইসলামি সেনাবাহিনী যখন মদীনা অভিমুখে রওনা হল তখন মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের গুজব মদীনায় ছড়িয়ে পড়ল। বনু দীনার গোত্রের এক মহিলা পাগলের মত ছুটতে ছুটতে উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে আসছিলেন। যুদ্ধে তাঁর স্বামী, এক ভাই ও পিতা এবং কোন কোন বর্ণনামতে তার এক পুত্রও শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর খবর শুনে তিনি পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। যাকেই দেখছিলেন জিজ্ঞেস করছিলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবস্থা কি? একজন খবরদাতা যেহেতু জানত যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বেঁচে আছেন, তাই সে তাকে বলল, তোমার পিতা মারা গেছে। সেই মহিলা কোন ভ্রুক্ষেপ না করে আবার জিজ্ঞেস করলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবস্থা কি? সেই ব্যক্তি বলল, তোমার ভাই মারা গেছে। সেই মহিলা আবার জিজ্ঞেস করলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবস্থা কি? সেই ব্যক্তি এরপরও বলল, তোমার ভাই মারা গেছে। সেই মহিলা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবস্থা কি? সেই ব্যক্তি তখন তার স্বামীর মৃত্যুর খবর দিল, পুত্রের মৃত্যুর খবর দিল। কিন্তু মহিলা এদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এ কথাই জিজ্ঞেস করতে থাকেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর খবর কি? লোকেরা যখন দেখল, মহিলার বাপ ভাইয়ের কোন তোয়াক্কা নাই এবং তার প্রকৃত অনুভূতি বুঝতে পারল তখন বলল, অমুকের মা! তুমি যেমন চাচ্ছ, আল্লাহ্‌র ফযলে রসুল (সা.) তেমনই ভাল আছেন। এতে মহিলা বললেন, দেখাও তিনি কোথায়? তারা বলল, ঐখানে দাড়িয়ে আছেন। মহিলা এক দৌড়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে পৌঁছে গেলেন আর তাঁর আচল ধরে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমার বাপ মা আপনার জন্য কুরবান। আপনি যখন ভাল আছেন আমি আর কারো জন্য চিন্তা করি না।

● হযরত মহানবী (সা.)-এর মুত্যুর পর হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.) এই পঙ্‌ক্তিটি বার বার আবৃতি করছিলেন।

কুনতাস সাওয়দা লিনাযিরি ফাআমিয়া আলাইকান নাযির

মান শা'আ বা'দাকা ফালইয়ামুত কুনতু আলাইকা উহাযির

হে আমার প্রেমাস্পদ! তুমি আমার চোখের মণি ছিলে। তোমার মৃত্যুতে আমি অন্ধ হয়ে গেছি।

এখন তোমার পর যে চায় মরুক, আমি তো তোমার মৃত্যুতেই ভয়ে ছিলাম।

সাহাবাগণের এই ভালবাসার ফলেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে ভালবেসেছিলেন। তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'লা রাযিয়াল্লাহু আনহু উপাধিতে ভূষিত করেছেন যার অর্থ আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁদেরকে আকাশের তারকারাজির সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁরা ততটাই প্রিয় ছিলেন যে, যার কারণে তাদের মধ্য থেকে ১০জনকে আল্লাহ্ তা'লা জীবিত থাকা অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। অতএব, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালবাসার ফলেই সাহাবাগণের প্রত্যেকের সাথে খোদা তা'লার এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

● হযরত খুবায়েব (রা.) কে একবার বন্দি করা হয়েছিল। যার বাড়িতে বন্দি করা হয়েছিল তার এক দাসী খুবায়েব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলে, "আল্লাহ্‌র কসম! আমি খুবায়েবের মত উত্তম বন্দী কখনো দেখি নি। আল্লাহ্‌র শপথ! একদা আমি দেখলাম তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় আঙ্গুরের ছড়া হতে আঙ্গুর খাচ্ছেন যা তাঁর হাতেই ছিল। অথচ এ সময় মক্কায় কোন ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না।" এখানে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে তাঁর খাবারের ব্যবস্থা করেছেন।

● মুনাফিকরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল। স্বয়ং মহানবী (সা.)-ও যে বিষয়ে সন্দেহে পড়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত আয়েশার অপবাদ খন্ডনের লক্ষ্যে সরাসরি মহানবী (সা.)-এর প্রতি ওহী করেন। আর এই ওহী সাধারণ ওহী ছিল না, বরং স্পষ্ট কুরআনের আয়াত ছিল যা কিয়ামত পর্যন্ত হযরত আয়েশার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে যাবে। একইভাবে মহানবী (সা.)-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত যত বড় বড় বুযুর্গ ওলী আল্লাহ্ ছিলেন তাদের প্রত্যেকে শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-কে ভালবাসার ফলস্বরূপ আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য পেয়েছেন।

মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র জগতের জন্য রসূল

মহানবী (সা.)-এর আরেকটি শ্রেষ্ঠত্ব হল, আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র জগতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সূরা আরাফের ১৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **কুল ইয়া আয়্যুহান্নাসু ইন্নি রাসুলুল্লাহি ইলাইকুম জামিয়্যা**। অর্থঃ তুমি বল! হে মানবজাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বে আবির্ভূত আল্লাহ্ তা'লার সকল নবী বিশেষ কোন স্থান বা কোন জাতি কিংবা কোন গোত্রের জন্য এসেছিলেন। তাঁদের শিক্ষা শুধুমাত্র যে জাতির নিকট তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন সে জাতির উদ্দেশ্যে এবং সে বিশেষ কালের জন্য ছিল যখন তাদের আবির্ভাব হয়েছিল। পক্ষান্তরে মহানবী (সা.) প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানবজাতির জন্য ও সর্বকালের জন্য। মানব ইতিহাসে তাঁর আগমন এক অনুপম ঘটনা। এর উদ্দেশ্য সকল জাতি ও মানবগোষ্ঠিকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করা যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণজনিত সকল ভেদাভেদ বিলীন হয়ে যাবে।

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমাকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয় নি। প্রথমত, আমাকে এক মাসের দূরুত্ব পর্যন্ত খোদা প্রদত্ত এক প্রতাপের অধিকারী করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমার জন্য সম্পূর্ণ পৃথিবীকে মসজিদ এবং পবিত্রতার মাধ্যম বানানো হয়েছে। তৃতীয়ত, আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না। চতুর্থত, আমাকে খোদা তা'লার নিকট সুপারিশ করার মর্যাদা দেয়া হয়েছে। পঞ্চমত, আমার পূর্বে প্রত্যেক নবী শুধুমাত্র নিজ জাতির প্রতি প্রেরিত হত, কিন্তু আমি সমগ্র পৃথিবী ও জাতিসমূহের জন্য প্রেরিত হয়েছি। *(বুখারী)*

অতএব, এই হাদিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মহানবী (সা.)-কে এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করা হয়েছে, যা অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই না। অতএব এই শান ও মর্যাদাসমূহের দিক দিয়ে তিনি (সা.) ছিলেন অনন্য ও অতুলনীয়। এখানে যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে তার মধ্য থেকে একটি বিষয়ে সামান্য আলোচনা করছি।

মহানবী (সা.)-কে খোদা প্রদত্ত প্রতাপের অধিকারী

● একবার এক ব্যক্তি আবু জাহলের কাছে তার পাওনা টাকা আদায়ের জন্য মক্কায় আসে। আবু জাহেলের কাছে টাকা চাইলে সে দিতে অস্বীকার করে। দুষ্ট লোকেরা তাকে পরামর্শ দিল, মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে সাহায্য চাইতে। সে তোমাকে পাওনা টাকা পেতে সাহায্য করবে। তারা ভেবেছিল, মুহাম্মদ (সা.) আবু জাহলের কাছে পাওনা টাকা চাইতে গেলে আবু জাহল তাকে গাল মন্দ করবে, লাঞ্ছিত করবে। এরপর সেই লোকটি যখন মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে অভিযোগ জানালো, তিনি (সা.) সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে আবু জাহলের বাড়িতে গেলেন এবং

দরজায় কড়া নাড়লেন। আবু জাহল ঘর থেকে বের হয়ে আসলে তিনি (সা.) তাকে সেই ব্যক্তির পাওনা টাকা ফেরত দিয়ে দিতে বললেন। আবু জাহল কোন প্রকার উচ্চ বাচ্চ না করে লোকটির পাওনা পরিশোধ করে দিল। দুষ্ট লোকেরা যখন তাকে ধরল, আবু জাহল! তুমি তো আমাদের কাছে খুব বল, মুহাম্মদকে লাঞ্ছিত করো, তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রেখো না, কিন্তু তুমি নিজেই তো তাঁর কথামত কাজ করলে এবং তাঁর সম্মান প্রতিষ্ঠা করলে। আবু জাহল, তাদেরকে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমার জায়গায় যদি তোমরা হতে তাহলে তোমরাও একই কাজ করতে। আমি দেখলাম, মুহাম্মদের ডানে ও বামে পাগলা উট দণ্ডায়মান এবং সেগুলো আমার ঘাড় মটকে আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। *(ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড)*

● হযরত মহানবী (সা.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন রাজা বাদশাহদের কাছে পত্র লিখেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিল পারস্য সম্রাট খসরু। মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন হোযাফার মারফতে পত্র প্রেরণ করলেন, সে পত্রটি শুনেই রাগান্বিত হয়ে ছিড়ে ফেলে দিল। অন্যদিকে সেখানে বসবাসরত আরবের ইহুদিরাও তাকে মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছিল। যাহোক, তখন খসরু ইয়েমেনের গভর্ণরকে পত্র মারফত আদেশ করে, **"কুরাইশদের এক ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবি করেছে, তাকে গ্রেফতার করে আমার সামনে হাজির কর।"** তার কথামত ইয়েমেনের সামরিক অফিসার মহানবী (সা.)-কে এসে বলে, পারস্য সম্রাট আপনাকে গ্রেফতার করে নিয়ে তার সামনে হাজির করতে বলেছেন। এটি শুনে রসুল করীম (সা.) বলেন, ঠিক আছে। তোমরা আগামীকাল আমার সাথে দেখা কর। সেদিন রাতেই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে তিনি (সা.) তাদেরকে বলে দিলেন যে, আজ রাতেই খসরুর পুত্র তাকে হত্যা করবে। এর কিছুদিন পরই ইয়েমেনের গভর্ণর খসরুর পুত্রের পক্ষ থেকে একটি পত্র পেল যেখানে লিপিবদ্ধ ছিল, "আমি আমার পিতা সাবেক খসরুকে হত্যা করেছি, কারণ সে দেশে রক্তপাতের রাস্তা খুলে দিয়েছিল। দেশের সম্ভ্রান্তদের হত্যা করছিল এবং প্রজাদের উপর যুলুম করছিল। আমার এই পত্র পাওয়া মাত্র তুমি সকল অফিসারকে আনুগত্যের শপথ করাবে এবং আমার পিতা আরবের এক নবীর বিরুদ্ধে যে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রেরণ করেছিল তা বাতিল বলে গণ্য হবে।"

এসব ঘটনা ছিল মহানবী (সা.)-এর খোদা প্রদত্ত প্রতাপের জীবন্ত নিদর্শন। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও মহানবী (সা.)-এর শান ও মর্যাদা ছিল অতীব উচ্চ।

মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতিচ্ছায়া ও প্রতিবিম্ব

মহানবী (সা.)-এর আরেকটি অতুলনীয় শান ও মর্যাদা হল, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নিজের প্রতিচ্ছায়া আখ্যা দিয়েছেন। সূরা আল ফাতাহ্‌র ১১নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **ইন্নাল্লাযিনা ইউবাইউনাকা ইন্নামা ইউবাইউনাল্লাহা। ইয়াদুল্লাহি ফাউকা আইদিহিম।** অর্থ: যারা তোমার বয়াত করে তারা বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্‌রই বয়াত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।

এই আয়াত মহানবী (সা.)-কে এক সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছে। যাঁরা মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে হাত রেখে বয়াত করে তারা প্রকৃতপক্ষে খোদার হাতে হাত রেখে বয়াত করে। অতএব এখানে মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতকে আল্লাহ্‌র হাত বলা হয়েছে।

একইভাবে সূরা আনফালের ১৮নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **ওয়ামা রামাইতা ইয রামাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা রামা।** বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.) শত্রুদের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করছিলেন তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আর তুমি যখন তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিলে তা তুমি নিক্ষেপ করোনি, বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন।" অন্য কথায় পর্দার অন্তরালে খোদায়ী শক্তি কাজ করেছিল।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমরা বড়ই গৌরবান্বিত, কেননা আমরা এমন এক নবীর আঁচল ধরেছি যাঁর উপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও কল্যাণের কোন সীমা ও অন্ত নেই। তিনি খোদা নন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মাধ্যমেই আমরা খোদাকে দেখেছি।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি

সূরা জুমুআর ৩নং আয়াতের আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"আর তিনি নিরক্ষরদের মাঝে এমন এক রসুল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের মাঝে তাদের আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান এবং তাদেরকে পবিত্র করেন।"**

মুহাম্মদ (সা.)-এর আরেকটি অতুলনীয় শান ছিল তাঁর পবিত্র ছোয়ার ফলে মৃত মানুষ জীবিত হয়ে উঠেছে। তিনি ছিলেন পরশ পাথর। যার স্পর্শে মদের আস্তানায় নেশাগ্রস্থ অবস্থায় পড়ে থাকা সাহাবাগণ পরবর্তীতে সারা দিন রোযা রেখে আর সারা রাত ইবাদত করে কাটিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। যেসব ব্যক্তি একটি আঘাতের শিকার হয়ে পাল্টা আক্রমণ না করা পর্যন্ত শান্তি পেত না, ক্ষান্ত হত না, তাঁরাই পরবর্তীতে এমন মানে উপনীত হন যে, হযরত আলী (রা.) ততক্ষণ পর্যন্ত তীরের বিধে যাওয়া অংশ খুলতে পারেননি যতক্ষণ না যিনি নামাযে সেজদায় অবনত হন। আরবের যুদ্ধংদেহী, রক্তপিপাসু ব্যক্তিরাই মহানবী (সা.)-এর স্পর্শে এমন হয়ে গেল যে, পরবর্তীতে নিজ ভাইয়ের জন্য ধন-সম্পদ, এমনকি প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ

করেননি। আরবী কাসীদায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি বর্ণনা করেন এভাবে:

আহইয়াইতা আমওয়াতাল কুরুনি বিজালওয়াতিন

মা যা ইউমাসিলুকা বি হাযাশ শানি।

তারাকুল গাবুকা ওয়া বাদ্দালু মিন যাওকিহি

যাওকাদ্দুআই বি লাইলাতিল আহযানি।

তুমি শত বছরের মুর্দাগুলোকে এক ঝাটকায় জীবন্ত করে দিয়েছ।

কে আছে যে এই মর্যাদায় তোমার তুল্য?

তারা রাতের মদ্যপান পরিত্যাগ করেছে আর এর পরিবর্তে

রাতের ব্যথিত দোয়ার স্বাদকে গ্রহণ করেছে।

মহানবী (সা.) সর্বাধিক উন্নত চরিত্রের অধিকারী

মহানবী (সা.)-এর আরেকটি শান হল, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, ইন্নাকা লা'আলা খুলুকিন আযীম। অর্থ: আর নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর উপর অধিষ্ঠিত। *(সূরা কলম: ৫)*

যে সকল পবিত্র ও নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশ একজন মানুষ অর্জন করতে পারে তার সবকটিই আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝে ছিল।

একবার হযরত আয়েশা (রা.)-কে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর চরিত্র বর্ণনা করতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেন, **কানা খুলুকুহুল কুরআন।** কুরআনই তাঁর চরিত্র। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যবান বান্দাদের বিশেষ চিহ্ন হিসেবে যে সকল উৎকৃষ্ট গুণাবলী কুরআনে উল্লেখ করেছেন তার সবগুলো তাঁর মাঝে ছিল। এখন কোন ব্যক্তি যদি সত্যবাদি, সভ্য, ভদ্র, শান্তিপ্রিয় ও আল্লাহ্ ও মানবাধিকার প্রদানকারী পরিপূর্ণ মানুষ হতে চায় তাহলে মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণই যথেষ্ট।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন,

"মুহাম্মদ (সা.) উভয় জগতের ইমাম ও প্রদীপ,

মুহাম্মদ (সা.) আকাশ ও পৃথিবী আলোকিতকারী।

আমি খোদা তা'লার ভয়ে তাকে খোদা বলতে পারি না.

কিন্তু খোদার কসম! তার সত্তা পরলোকবাসীর নিকট খোদা দর্শনের দর্পণ॥

মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ

মহানবী (সা.)-এর শান ও মর্যাদা এত উন্নত ছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ্ ও তার ফেরেশতারা তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি প্রেরণ করেন এবং মুসলমানদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যেন তারাও প্রতিনিয়ত এই মহান নবীর উপর রহমত প্রেরণ করে। পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ৫৭নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা দিচ্ছেন, ***ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান্নাবিয়্যি। ইয়া আয়্যুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা।*** অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবী (মুহাম্মদ সা.) এর উপর রহমত ও শান্তি প্রেরণ করেন এবং ফেরেশতাগণও তাঁর জন্য দরুদ প্রার্থনা করছে। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তার জন্য রহমত ও দরুদ প্রেরণ কর এবং পরিপূর্ণ শান্তি কামনা কর।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "সেই মানব যিনি সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ ও প্রকৃত অর্থেই যিনি পরিপূর্ণ মানব ও পরিপূর্ণ নবী এবং যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান এবং পুনরুত্থান সংঘটিত হয়, পৃথিবীতে প্রথম কিয়ামত প্রদর্শিত হয়েছে এবং এক মৃত জগত পুনরায় জীবিত হয়ে উঠেছে। সেই কল্যাণ মণ্ডিত নবী হচ্ছেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুল আসফিয়া, খাতামুল মুরসালিন, ফখরুন্নাবীঈন জনাবে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। হে আমাদের খোদা! তুমি আমাদের এই প্রিয়তম নবীর উপর সেই রহমত ও দরুদ বর্ষণ কর যা পৃথিবীর আদিকাল থেকে অদ্যবধি অন্য কারো উপর বর্ষণ করো নি।"

ইয়া রাব্বি সাল্লি আলা নাবিয়্যিকা দাইমান। ফি হাযিহিদ্দুনইয়া ওয়া বা'সিন সানি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আল্লা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আল্লা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর- **আলহাজ্জ মাহবুব হোসেন,**
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

এতায়াতে নেযাম

মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ্

এতায়াতে নেযাম সম্পর্কে জানতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার নেযামে খেলাফত কি? নেযামে খেলাফত হলো **'ওয়াতাসেমু বে হাবলিল্লাহে জামিআঁও ওয়ালা তাফাররাকু'**। এটি ঐ হাবলুল্লাহ্ (রশি) যা আমাদেরকে খোদাতালার সাথে সম্পর্কযুক্ত রাখে। সবধরণের দলাদলি বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত রাখে। নেযাম ঐ বৃক্ষ যার ছায়া আমাদের সব ধরণের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপদ রাখে। নেযামের আনুগত্যের মধ্যেই মুসলমানদের সব ধরণের সফলতা সম্পৃক্ত।

সূরা নিসা - ৬০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অর্থাৎ- হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাঁদের যাঁরা তোমাদের আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তাহলে তোমরা তা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। এটা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়ে অতি উত্তম।

এতায়াত শব্দের অর্থ হলো আনুগত্য। এতায়াতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবীগণের ধারণা ছিল গভীর। তাঁরা এতায়াতের এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যা জগতে আর কোথাও এভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁদের আনুগত্যের মান এমন ছিল যা ভাষায় প্রকাশ করাও সম্ভব নয়।

হাদীসে এসেছে "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা মূসার জাতির মত এটা বলবো না, তুমি আর তোমার খোদা গিয়ে যুদ্ধ কর। বরং আমরা আপনার ডানে লড়বো, বামে লড়বো, সামনে লড়বো, পিছনে লড়বো। সর্বাবস্থায় আমরা আপনার এতায়াত করবো"

এমন ই একটি ঘটনা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি, সাহাবীরা কিভাবে ডানে, বামে, সামনে, পিছনে থেকে আনুগত্য করতে গিয়ে লাব্বাইক বলেছেন।

"ওহুদের যুদ্ধে হযরত রসূলে করীম (সা.)-কে লক্ষ্য করে অমুসলমানরা বৃষ্টির মত তীর মারছিল। আর হযরত তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর মোবারক চেহারার সামনে নিজের হাতকে তুলে ধরে তীরকে প্রতিহত করছিলেন। সমস্ত তীরের ফলা তার হাতে বিঁধল। কিন্তু তিনি উফ শব্দটিও উচ্চারণ করেন নি। এই ভয়ে যে, পাছে না আবার উফ শব্দ করার কারণে তাঁর হাত সরে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর মোবারক চেহারায় তীরের আঘাত লাগে। তালহা (রা.)-এর হাত পরবর্তীতে তীরের আঘাতে অকেজো হয়ে যায়। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাহাবীরা প্রিয় নবীর চেহারায় সামান্য আঁচড় পর্যন্ত লাগতে দেন নি।

সাহাবীগণ রসূল (সা.)-এর কিরূপ এতায়াত করতেন তা বর্ণনা করে শেষ করার নয়। দু' একটি ঘটনা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

"মদ্যপান যখন হারাম করা হলো তখন রসূল করীম (সা.) চতুর্দিকে এর ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। একজন ঘোষণা দিচ্ছিলেন, এমন সময় সাহাবীরা মদের আসরে ব্যস্ত ছিলেন। কেউ মদের গ্লাস মুখে নিচ্ছিলেন, কেউ বা গ্লাসে মদ ঢালছিলেন। তখনই মদ হারাম এই আওয়াজ ভেসে আসলো তাদের কানে। কেউ একজন বলছিল, চল দেখি ব্যাপার কি? কিন্তু অন্যান্য সাহাবীরা এ কথায় কান না দিয়ে মদ হারাম আওয়াজ শুনা মাত্রই মদের পেয়ালা, গ্লাস, পাত্র, মদের মটকা ভেঙ্গে ফেললেন। মদীনার অলি গলিতে মদের শ্রোত বইয়ে দিল।" এই ছিল সাহাবাদের আনুগত্যের মান।

অপর এক হাদীসে এসেছে, একদা এক যুদ্ধের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) মাল কুরবানী করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "তোমাদের যা কিছু আছে নিয়ে আস। হযরত উমর (রা.) তার যত সম্পদ ছিল তার অর্ধেক রসূল করীম (সা.)-এর কাছে পেশ করলেন। আর হযরত আবুবকর (রা.) ঘরে যা ছিল সামান্য যব, চুলায় জ্বালানো লাকড়ি ইত্যাদি রসূল (সা.)-এর কাছে পেশ করলেন। রসূল করীম (সা.) উমরকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে উমর! তুমি কি নিয়ে এসেছো। উত্তরে উমর (রা.) বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার যত সম্পদ ছিল তার অর্ধেক আপনার নিকট পেশ করলাম। এরপর মহানবী (সা.) হযরত আবুবকরকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুবকর! তুমি কি নিয়ে এসেছ? উত্তরে হযরত আবুবকর (রা.) বলল আমার ঘরে যা ছিল আমি তা-ই নিয়ে এসেছি। তাহলে ঘরে কি রেখে এসেছো? উত্তরে আবুবকর বলল, ঘরে আল্লাহ্ আর আল্লাহ্‌র রসূলকে রেখে এসেছি।"

প্রিয় পাঠক! দেখুন, এই হলো সাহাবাদের এতায়াত বা আনুগত্যের মান। রসূল করীম (সা.)-এর নির্দেশ ছিল; যা আছে তা-ই নিয়ে আস। আর সাথে সাথেই লাব্বাইক। অর্থাৎ শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।

পবিত্র কুরআনে সূরা আল ইমরানের ৩১-৩২ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, যদি তোমরা আমাকে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাস তাহলে সেই মহান রসূলকে ভালোবাস। তাঁর (সা.)-এর অনুসরণ কর এবং আনুগত্য কর। রসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর ভালবাসা লাভ করতে পারি। তাই প্রথমে আমাদেরকে রসূল (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে তবেই আমরা খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে পারবো।

পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ৮১ আয়াতে বলা হয়েছে, আমরা যদি রসূল (সা.)-এর আনুগত্য করি তাহলেই আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা হবে।"

হাদীসে এসেছে মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমরা শুন ও আনুগত্য কর যদিও শুকনো আঙ্গুরের মত ক্ষুদ্র মাথা বিশিষ্ট কোন হাবশী গোলামকে তোমাদের শাসক বা নেতা নিয়োগ করা হয় তবুও তার আনুগত্য কর। *(বুখারী)*

পবিত্র কুরআনে সূরা নূরের ৫২ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "মোমেনদেরকে যখন আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ডাকা হয়। যেন সে (অর্থাৎ রসূল) তাদের মধ্যে মীমাংশা করে দেয় তখন তাদের কথা কেবল এটাই হয়ে থাকে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।"

এতায়াত বা আনুগত্য প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এমন জরুরী বিষয় বা আবশ্যকীয়, মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করল। যে আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমারই অবাধ্যতা করল" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অতএব আমরা যদি শাসক বা আমীরের অবাধ্যতা করি তাহলে তা আল্লাহ্ এবং রসূলের অবাধ্যতা করা হবে। তাই কোন অবস্থাতেই তাদের অবাধ্যতা করা যাবে না।

মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, 'শাসকের নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, সেটা তার পসন্দ হোক বা অপছন্দ হোক। *(বুখারী ও মুসলিম)*

যারা এতায়াত বা আনুগত্য করবে না তাদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি বলেন, "আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাগুলো লংঘন করে, তিনি তাকে এমন আগুনে প্রবেশ করাবেন যেখানে সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে এক লাঞ্ছনাদায়ক আযাব।" *(সূরা নিসা-১৫)*

আবার পবিত্র কুরআনে সূরা আল্ জিন্ ২৪ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে, তার জন্য নিশ্চয় থাকবে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে"

অতএব আমাদের মধ্যে আনুগত্য না থাকলে কোন কাজেই সফলতা আসবে না। বরং সমস্ত কর্মই বিফলে যাবে, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

এ মর্মে পবিত্র কুরআনে সূরা মুহাম্মদ-৩৪ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্মকে বৃথা যেতে দিও না।"

অনুরুপ ভাবে সূরা মায়েদা ৯৩ আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, এই রাসূলের আনুগত্য কর এবং (অবাধ্যতা থেকে) সাবধান থাক।"

যাদের মনে এরূপ ধারণা রয়েছে, যারা আদেশ দেয়ার অধিকারী তারাতো সঠিকভাবে অধিকার প্রদান করে না, তাই তাদের আনুগত্য জরুরী নয়। তাদের এই ধারণা নিত্যান্তই ভুল।

হাদীসে এসেছে, "সালামা ইবনে ইয়াযিদ আল জুফী (রা.) হযরত রসূল করীম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের উপর যদি এরূপ শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন হয়, যারা তাদের অধিকার আমাদের থেকে পুরোপুরি নেয় কিন্তু আমাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করে না তখন আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি? এ কথা শুনে রসূল করীম (সা.) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। সালামা পুনরায় জিজ্ঞেস করলে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা শুনবে ও আনুগত্য করে যাবে। কারণ তাদের (পাপের) বোঝা তাদের উপর, তোমাদের বোঝা তোমাদের উপর।" *(মুসলিম)*

তাই আমাদের কাজ হলো এতায়াত করা এবং ধৈর্য্য ধরা। যারা নেযামের দায়িত্বে রয়েছেন সর্বাবস্থায় তাদের এতায়াত করতে হবে।

আনুগত্য না করলে জাহান্নাম নির্ধারিত:

রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি তার নেতার মধ্যে কোন অপ্রীতিকর কিছু লক্ষ্য করে, তাহলে সে যেন ধৈর্য্য ধরে। কারণ যে ইসলামী রাষ্ট্র হতে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গিয়ে মারা যায়, সে জাহিলিয়াতে মৃত্যুবরণ করে।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

অপর এক হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত সরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌র সাথে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার পক্ষে কোন যুক্তি থাকবে না। যার ঘাড়ে

আনুগত্যের বন্ধন নাই এমন অবস্থায় যে ব্যক্তি মারা যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।' *(মুসলিম)*

আনুগত্য করলে জান্নাতের সুসংবাদ:

অতএব আমাদেরকে সর্বাবস্থায় আনুগত্য করতে হবে। এর মধ্যেই কল্যাণ নিহীত রয়েছে। যারা আনুগত্য করবে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে সূরা নিসা-১৪ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমনসব জান্নাতে প্রবেশ করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এ হলো মহান সফলতা।"

শুধু জান্নাতই নয় বরং সূরা নিসা-৭০ আয়াতে পুরস্কারেরও ঘোষণা দেয়া হয়েছে, "আর যে আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করবে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা চারটি পুরস্কারে ভূষিত করবেন, (১) নবী (২) সিদ্দিক (৩) শহীদ এবং (৪) সালেহ। আর এরাই সঙ্গী হিসেবে উত্তম।"

যদি পুরস্কার পেতে হয়, জান্নাত লাভ করতে হয়, আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করতে হয় তাহলে আনুগত্য আবশ্যক।

আনুগত্য বা এতায়াত কাকে বলে। এতায়াত কেমন হয়? এখন আমি আপনাদের সম্মুখে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.), হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বর্তমান খলীফা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর যুগে সংঘটিত এতায়াতের ঘটনা তুলে ধরছি। যা তিন জনের যুগেই ঘটেছে।

মহানবী (সা.)-এর যুগে একবার তিনি মসজিদে দাঁড়ানো সাহাবীদের বললেন বসে যাও। সে সময় আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) গলি দিয়ে অথবা বাজারে দিয়ে আসছিলেন। তিনি বসে যাও এ আওয়াজ শুনা মাত্রই বসে গেলেন। আর বসে বসেই মসজিদের দিকে আসছিলেন। কোন এক ব্যক্তি বলল এ নির্দেশ তো যারা মসজিদে রয়েছে তাদের জন্য। তখন সেই সাহাবী উত্তরে বললেন, আমার কাজ হলো শুনা মাত্রই এর আনুগত্য করা, এতায়াত করা। আর আনুগত্য করাই আমার কাজ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগেও অনুরুপ ঘটনাই ঘটেছে। একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মসজিদে দাঁড়ানো লোকদের বললেন তোমরা বসে যাও। মিয়া করীম বখশ (রা.) তখন মসজিদের পাশের গলিতে ছিলেন। বসে যাও এ আওয়াজ শুনা মাত্রই সেখানেই বসে গেলেন। কোন একজন কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন যখন মসীহ্‌র নির্দেশ আমার কানে পৌঁছে তখন আমার একটাই কাজ হলো আমি যেন তখনই তার আনুগত্য করি, এতায়াত করি।

এমনই ঘটনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি। তিনি যখন খলীফা হলেন। মসজিদের বাহিরে তখন এগার হাজারেরও বেশি লোক রাস্তায় বয়াত নেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। কন কনে শীতের রাত। লোকদের দাঁড়ানোরই জায়গা হচ্ছিল না। হুযুর আনোয়ার (আই.) বয়াত নেয়ার পূর্বে মসজিদ ফযলের লোকদের বললেন 'ব্যাঠ যাঁও' বসে যাও এ শব্দ লাউড স্পিকারে বাহিরেও এসেছে। তখনকার দৃশ্য আমরা এম.টি.এ-তে সরাসরি দেখেছি। যেখানে তাদের দাঁড়ানোরই জায়গা হচ্ছিল না। সেখানে তাদের প্রিয় ইমামের নির্দেশ শুনা মাত্রই ঠাণ্ডার মাঝে রাস্তাতেই বসে পড়লো। কেউ এ চিন্তা করলো না যে, রাস্তা কত ঠাণ্ডা, কত ময়লা রাস্তায় পড়ে রয়েছে। তখন তারা শুধু এটাই বুঝেছে, শুনেছি; মানতে হবে এছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই।

এতায়াতের এমন ঘটনা, এমন দৃষ্টান্ত আজ ইসলাম ও আহমদীয়াত ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

অতএব প্রিয় পাঠক! আমাদেরকে বুঝতে হবে, আমাদের আনুগত্যের মানদন্ড কেমন হওয়া উচিত।

এতায়াতের মানদণ্ডে আজ আহমদীরাই একমাত্র জাতি যারা তাদের খলীফার সামনে, যুগ ইমামের সামনে মাথা নত হয়ে ঘোষণা দেয়-

'হে আমাদের প্রাণ প্রিয়! তুমি নেকীর যে রাস্তায় আমাদেরকে ডাকবে আমরা পাগলপারা, তোমার ইশারায় নিজের জান-প্রাণ, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান সবই বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। আমাদের জীবন, আমাদের মরণ তোমার পদতলে হবে। আমরা প্রত্যেকে আজ এ অঙ্গীকার করছি, তোমার নির্দেশই আমাদের লক্ষ্য হবে। তোমার প্রতিটি নির্দেশে লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলে এমনভাবে সাড়া দিব, আমাদের এতায়াত দেখে ফিরিশতারাও ঈর্ষা করবে। আরশের খোদাও খুশি হবেন। হে আমাদের আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে এ শক্তি দাও আমরা যেন এ অঙ্গীকার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পূর্ণ করতে পারি। খলীফার প্রত্যেক ডাকে শুনলাম আর মানলাম এ নীতি অনুসরণ করে লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলে সাড়া দিতে পারি।

প্রিয় পাঠক, আশা করি সকলের নিকট বিষয়টি বোধগম্য হয়েছে, যদি সকলেই এর উপর আমল করি, সর্বদা নেযামের আনুগত্য করি, যদি যুগ খলীফার ডাকে 'হার হাল মে' লাব্বায়েক বলতে পারি তাহলে আমাদের জীবন ধন্য হবে। আমাদের এই লেখা সার্থক হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে উপরোক্ত বিষয়টি বোঝার এবং এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন ॥

গত ২৬শে অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, জার্মানির সাবেক সদর জনাব হাসানাত আহমদ সাহেবের বিদায়ী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর বক্তব্য

তাশাহ্হুদ, তাউয, তাসমিয়া পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান মূলত বিদায়ী সদর খোদ্দামুল আহমদীয়ার সম্মানে আয়োজন করা হয়েছে। তিনি তার সদর এর ছয় বছরের মেয়াদকাল সম্পন্ন করেছেন। যদিও তিনি এখন পর্যন্ত খোদ্দামুল আহমদীয়ারই সদস্য আর বর্তমান সদরও গত এক বছর থেকে দায়িত্ব পালন করছেন।

আল্লাহ্‌তা'লার অপার কৃপায় খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরা বিশ্বের সকল দেশেই খুব ভালো কাজ করছেন। বিদায়ী সদর সাহেবকে আমি শুধু একথাই বলবো, এখন তার ওপর জামাতেরও বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে– সেসব জামাতী দায়িত্বের কারণে তার মধ্যে পূর্বে একজন খাদেম হিসেবে সেবার যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল তা নষ্ট হয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। এমনটি মনে করবেন না যে, আমি এখন বিভিন্ন পদ পেয়ে গেছি আর এসব পদের কারণে আমার মর্যাদা অনেক বড় হয়ে গেছে। বরং প্রত্যেক কর্মকর্তার এটি মনে করে উচিৎ, মহানবী (সা.) বলেছেন, "সাইয়্যেদুল কওমে খাদেমুহুম" অর্থাৎ, জাতির নেতা মূলত তাদের সেবক হয়ে থাকে। এই মানসিকতা বা চেতনা যদি আমাদের কর্মকর্তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে একটি বিপ্লব সৃষ্টি হতে পারে। আপনারা বিভিন্ন কবিতা পাঠ করেন, জ্বালাময়ী বক্তৃতাও প্রদান করেন। বড়বড় প্রতিশ্রুতিও দেন আর তারা নাও পড়েন; কিন্তু কার্যত তখনই লাভ হবে যখন আপনাদের চিন্তা-চেতনা সেই কথার সমর্থন যোগাবে। আপনাদের কর্ম সেই বক্তব্যের সমর্থন যোগাবে। কাজেই নতুন সদর সাহেবকেও একথা খেয়াল রাখতে হবে আর প্রত্যেক কর্মকর্তাকে, মোটকথা আমীর থেকে আরম্ভ করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেককে স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ্‌তা'লার কৃপা বলেই তিনি তাকে সেবার তৌফিক দিয়েছেন, বস্তুত এটি কারো কোন হক বা অধিকার নয়। কাজেই এই কৃপাকে সর্বদা স্মরণ রাখবেন।

কায়েদগণও এখানে উপবিষ্ট আছেন–তাই খোদ্দামুল আহমদীয়ার বরাতে একথাও তাদেরকেও বলে দিচ্ছি যে, খোদ্দামুল আহমদীয়ার অনেক বড় একটি কাজ হল, আহমদীয়া খিলাফতের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আর এজন্য তারা অঙ্গীকারও করেন। আর খিলাফতের হিফাযত বা সুরক্ষা বলতে শুধুমাত্র উমুমীর ডিউটি দেওয়া বা হিফাযতে খাস এ ডিউটি দেওয়াই নয়। এই কাজ তো অন্যরাও করতে পারে। সত্যিকার হিফাযত হল, যুগ খলীফার বাণী বা কথা প্রচার করা, এর ওপর আমল বা অনুশীলন করা আর এর ওপর অনুশীলন করানো এবং নব প্রজন্মের তত্ত্বাবধান করা। কেবলমাত্র মুখেমুখে এই দাবী করা যে, আমরা ডানেও লড়বো, বামেও লড়বো আর অগ্রে-পশ্চাতেও লড়বো। আসলে এটি লড়াই করার বিষয় নয়। বর্তমান সময়ের লড়াই বা সমসাময়িক জিহাদ হল, খলীফার নির্দেশের ওপর আমল করা আর এটিই মূল কাজ যা খোদ্দামুল আহমদীয়াকে করতে হবে। এ টিপ্রত্যেক কায়েদ, যয়ীম, নায়েম, মোহতামীম এবং সদর সাহেবের কাজ। অতএব, এ বিষয়টি সদা মনে রাখবেন, যেসব কথা বলা হয় বা যেসব নির্দেশনা দেওয়া হয়–আপনারা আমার বিভিন্ন খুতবাও শোনেন, বক্তব্যও শোনেন–এর ওপর আমল করুন আর এগুলোর ওপর আমল করান। আর এক্ষেত্রে নিজেদের ব্যবহারিক আদর্শ উপস্থাপন করলে অন্যরাও এর ওপর আমল করার চেষ্টা করবে। আমার স্মরণ আছে, আমার খিলাফতের শুরুর দিকে মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব আমাকে লিখেছিলেন, খলীফাদের বিভিন্ন খুতবা ও বক্তৃতার সংকলন ছাপা হয় কিন্তু তা তাঁদের তিরোধানের পর ছাপা হয়– অথচ এগুলো তাঁদের জীবদ্দশায় ছাপানো উচিৎ। তিনি তার ইচ্ছা ব্যক্ত করে একথা লিখেছিলেন। তাই আমার আকাঙ্ক্ষা হল, পঞ্চম খিলাফতের তাজা খুতবাগুলো যেন প্রতিবছর সাথে সাথে ছাপা হয়। তার কথা ঠিক ছিল তাই আমি এর অনুমতি দিয়ে দেই। আল্লাহ্‌তা'লা আহমদীয়া জামাতের খলীফাদের মধ্যে এবং ভবিষ্যতেও খলীফা হতে থাকবেন–প্রত্যেকের জন্য একটি যুগ নির্ধারিত রেখেছেন আর প্রত্যেককে সেই যুগের চাহিদার নিরিখে তিনি স্বয়ং (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌তা'লা) পথনির্দেশনা দিচ্ছেন আর বর্তমান যুগের চাহিদা অনুসারে যুগ খলীফাকে পথনির্দেশনা দিচ্ছেন। তাই

সেই যুগ যখন শেষ হয়ে যায় আর নতুন খলীফা নির্বাচিত হন আর নতুন খলীফাকে যখন আল্লাহ্‌তা'লা এ সম্মানে ভূষিত করেন তখন পুরনো পুস্তক না ছাপিয়ে আল্লাহ্ যেভাবে (সমসাময়িক চাহিদা অনুসারে) পথনির্দেশনা দেন সে অনুযায়ী চলতে হবে। একথা ঠিক যে, (পুরনো বক্তব্য ইত্যাদি থেকে) অনেক ঐতিহাসিক অথ্য-উপাত্তও পাওয়া যায়, বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদিও পাওয়া যায়–তাই সেগুলো ছাপানো উচিৎ। কিন্তু আমলের জন্য আবশ্যক হল, যুগ খলীফার কথা শোনা এবং সে অনুযায়ী অনুশীলন করা। (খলীফার) এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই ছিল বা ঐ ছিল–এমনটি বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যারা নিজেদের মধ্যে আলাপ চারিতার সময় বলে বসে যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের একথা বা এই বাক্য বলার উদ্দেশ্য ছিল এটি। যদি উদ্দেশ্য এটি হয়ে থাকে বা যদি ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় হয় তাহলে খলীফায়ে ওয়াক্ত উপস্থিত আছেন তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন। আর যদি পূর্ববর্তি খলীফাদের কথা হয় আর তাঁদের কথার মর্ম অনুধাবনে সমস্যা দেখা দেয় তাহলে এর সমাধান দেওয়া এবং এর ব্যাখ্যা করাও যুগ খলীফার কাজ। অথবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন উদ্ধৃতি বা তাঁর কোন কথার ব্যাখ্যা কি হবে? এই কাজ কোন কর্মকর্তার নয়। এর ব্যাখ্যা কি হবে সে সিদ্ধান্ত প্রদান করা যুগ খলীফার কাজ। কাজেই খোদ্দামুল আহমদীয়া সর্বদা মনে রাখবেন, সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা সদা স্মরণ রাখবেন, আপনাদেরকে যুগ খলীফার কথামালার প্রতি দেখতে হবে, তাঁর কথা শুনতে হবে আর সেগুলোর ওপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। অতীতে কি উদ্দেশ্য ছিল এবং আগের কথা নিয়ে টানা হেঁচড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌তা'লা যতদিন উত্তম মনে করেন একজন খলীফাকে জীবন দান করেন আর তাঁর কাজকে জারি রাখেন আর তিনি যখন উত্তম জ্ঞান করেন তখন একটি যুগের যবনিকাপাত ঘটে এবং পরবর্তি যুগ আরম্ভ হয়। কাজেই এই বাস্তবতাটি প্রত্যেক কর্মকর্তাকে অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিৎ। আর বিশেষভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজ হল, খিলাফত ব্যবস্থাপনার সুরক্ষার দায়িত্ব যেহেতু তাদের স্কন্ধে ন্যস্ত তাই সুরক্ষা বিধানের জন্য আবশ্যক হল, নিজেদের যুবকদের মাঝে এবং নিজ সন্তানদের মাঝে এই চেতনা সৃষ্টি করা যে, তোমাদেরকে যুগ খলীফার কথা শুনতে হবে এবং এর ওপর আমল করতে হবে। আর এমন কাজই আপনাকে খিলাফতের সুরক্ষার যোগ্য করে গড়েতুলে এছাড়া বাকি সব কিছুই বুলি সর্বস্ব।

অতএব, আমি দোয়া করি, আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে সত্যিকার অর্থেই খিলাফতের সুরক্ষা বিধানের তৌফিক দান করুন আর আপনারা যুগ খলীফার সত্যিকার সাহায্যকারীদের দলভুক্ত হোন। যুগ খলীফার সুলতানে নাসীর বা সাহায্যকারী হাত হোন। আর আহমদীয়া খিলাফতের যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে–সত্যিকার অর্থেই এর সুরক্ষকারী হোন। আর যেমনটি আমি বলেছি, যুগ খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এর ওপর আমল করুন আর আমল করানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করুন আর তা প্রচার করুন–তবেই এটি সম্ভব। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

কবিতা

এমটিএ খোদার এক মহাদান

খন্দকার মাহবুবউল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট, রংপুর

এমটিএ সেতো খোদার এক মহাদান
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে খলীফার আহ্বান

মুখের ফুৎকারে নি নিভাতে চেয়েছিল খোদার আহ্বান
গর্জে উঠল ব্যাঘ্র খোদার, হয়ে গেল সে খান খান
নীল আকাশে হল সে বিলীন, শত্রুরা সাবধান
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে খলীফার আহ্বান
এমটিএ সেতো খোদার এক মহাদান ॥

দিকে দিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ইমাম মাহদীর আহবান
ত্রিত্ববাদের পূজা ছেড়ে এসো মুহাম্মদের নৌকায় কর আরোহন
আনছে ঈমান কতো পূণ্যবান শুনে প্রোগ্রাম এমটিএ অনির্বাণ
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে খলীফার আহ্বান
এমটিএ সেতো খোদার এক মহাদান ॥

ঘৃণা বিদ্বেষ সন্ত্রাস আর অশান্তির হবে চির অবসান
মেনে নাও যদি কুরআনের বাণী আর রসূলের (সা.) ফরমান
মহান এ বার্তা বুকে বয়ে নিয়ে খলীফা ছুটছেন সারা জাহান
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে খলীফার আহ্বান
এমটিএ সেতো খোদার এক মহাদান ॥

দিবারাত্রি কত প্রোগ্রাম শত, এ যে এমটিএ'র অবদান
সাত দিন পরে লাইভ খুতবা কি আনন্দ অফুরান
বিশ্ববিজয়ে এমটিএ হোক সব থেকে আগুয়ান
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে খলীফার আহবান
এমটিএ সেতো খোদার এক মহাদান ॥

স্মৃতির পাতা থেকে–

৫ম খিলাফতের প্রথম শহীদ শাহ্ আলম সাহেবের স্মরণে

সংকলনে: **মোহাম্মদ জাহিদ হাসান আব্দুল্লাহ্**

১৯৫০ সালে কুমিল্লার মতলব থানার কচুয়াতে (বর্তমানে চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানা) অহেদ আলী ও সালেহা বেগমের ৪র্থ সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন শাহ আলম সাহেব। ছোটবেলা থেকেই তিনি পড়াশোনার প্রতি ছিলেন আগ্রহী। ৫ ভাইয়ের মধ্যে তিনিই একমাত্র শিক্ষিত ছিলেন। ১৯৬২ সালে তাঁর পরিবারের সবাই কুমিল্লা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যশোর জেলার ঝিকোরগাছা থানার রঘুনাথপুর বাগ গ্রামে চলে আসেন। এখানে আসার পর থেকেই তাঁর পরিবার বিশেষ করে তিনি এলাকার সকলের প্রিয় ভাজন হয়ে ওঠেন। তিনি সকলের সাথে সবসময় মিষ্টি হাসিতে কথা বলতেন এবং সকলকে শ্রেণী বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করতেন। তিনি স্থানীয় একটি মাদ্রাসা ও ১টি হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং মাদ্রাসায় শিক্ষকতার পাশাপাশি হাই স্কুলের ম্যানিজিং কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ সালের দিকে সুন্দরবন জামাতের অন্তর্গত হরিনগর এর মরহুম আকবর গাজী সাহেবের মাধ্যমে তিনি জামাতে আহমদীয়ার সংবাদ পান এবং সেই বছরই খুলনা জামাতে ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন ও জামাত সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন। অনেকটা বোঝার পর তিনি বকশী বাজার কেন্দ্রীয় জামাতে গিয়ে বয়াত গ্রহণ করেন। বয়াত গ্রহণ করার পূর্বে শহীদ শাহ আলম সাহেবকে বলা হয়, আপনি আরো ভালভাবে জামাত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করুন তারপর বয়াত গ্রহণ করেন। তিনি এর উত্তরে বলেন, "আমি যদি আজ যুগ খলীফাকে না মেনে মারা যাই তাহলে আমার দায়িত্ব কি আপনি নিবেন? আমি মৃত্যুর পূর্বে যুগ ইমামকে মেনে মরতে চাই। অতঃপর বয়াত পরিচালনাকারী শহীদ শাহ আলম সাহেবের বয়াত গ্রহণ করেন। (যদিও তার আগে জালাল আহমদ সাহেব রঘুনাথপুর বাগ এর প্রথম আহমদী তবে গোপনে ছিলেন)। বয়াত গ্রহণের পর তিনি প্রথমে তাঁর পাঁচ ভাইদেরকে বোঝান, আলহামদুলিল্লাহ্। তখন ৫ ভাই সকলে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হন এবং আজও তাদের সন্তানেরা জামাতের সাথে সম্পৃক্ত। ১৯৮৮ সালের প্রথমে জামাত প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময়ে তিনিই প্রথম মসজিদ স্থাপনের জন্য জমি দান করেন। এবং গমের খড় দিয়ে ছাউনি ও বেড়ার তৈরী মসজিদ নির্মিত হয়। আস্তে আস্তে আশেপাশের প্রায় ২০/২৫টি পরিবার তাঁর তবলীগে আহমদীয়াত গ্রহণ করে। (আলহামদুলিল্লাহ্)

জামাত প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে/পরে মোয়াল্লেম ও মুরুব্বী সাহেবগণ রঘুনাথপুর বাগে থাকাকালে তাদের সাথে তিনি ও তাঁর পরিবার সব সময় আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করেছেন এবং সব সময় জামাতের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। অনেক বুযূর্গ মোয়াল্লেম মুরুব্বী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের এবং শহীদ শাহ আলম সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে ধীরে ধীরে রঘুনাথপুর বাগ জামাত উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ২০০০ সালে যখন বন্যা হয় তখন মসজিদটাও বন্যায় ভেসে যায়। স্থানীয় জামাতের সদস্যদেরকে কেন্দ্র থেকে পরিবার প্রতি কিছু অনুদান দেওয়া হয়, তার পরামর্শে সকলে একমত পোষণ করে সেই টাকাতে মসজিদটা পাকা করা হয়। সব সময় তিনি জামাতের উন্নয়নের কথা এবং জামাতের সদস্যদের জন্য দোয়া করতেন। হঠাৎ অক্টোবর ২০০৩ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে রচিত হল নতুন এক অধ্যায়। ৩১ অক্টোবর ২০০৩ সালের ৪র্থ রমযান রোজ শুক্রবার ৫ম খেলাফতের ১ম শাহাদতকারী হিসেবে আহমদীয়াতের ইতিহাসে স্থান পেলেন রঘুনাথপুর বাগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ও ১ম প্রেসিডেন্ট আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা শহীদ শাহ আলম সাহেব।

ঘটনার সূত্রপাত হয় চলতি মাসের অর্থাৎ অক্টোবর ২০০৩ এর ২য় সপ্তাহে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উত্তর ভবানীপুর জামাতে

আহমদীরা মসজিদে আক্রমণের খবর জাতীয় পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার পর দুই মসজিদের মুসল্লিরা গোপনে মিটিং করে ৩১ অক্টোবর ৪র্থ রমযানে আমাদের মসজিদ আক্রমণের দিন ধার্য করে এবং পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী আক্রমণ করে এবং আমাদের মসজিদ দখল করার জন্য দুই মসজিদের সদস্যরা আক্রমণ করে। শহীদ শাহ আলম সাহেব জুমুআর নামায শেষে নিজ বাড়িতে ৩/৪ জন নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। তারা আসার সাথে সাথে সালাম দিলেন কিন্তু তারা সালামের উত্তর দিলেন না। তারাই আবার দাবী করেন আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠাকারী ও নবীর যোগ্য উত্তরসূরী। সালামের উত্তর না পেয়ে তাদের বসতে দেওয়া হল। তারা বলল বসার জন্য আসি নি এই কথা বলেই আতিয়ার সাহেবের মুখে ঘুষি মারলেন। শাহ আলম সাহেব সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন যা বলার আমাকে বল। তারা বলল, বলার কথা একটাই কোন আলাদা মসজিদ থাকবে না, কোন কাদিয়ানী থাকা যাবে না। উত্তরে শাহ আলম সাহেব বললেন না-তা কেন হবে? আমরা বসি যদি কুরআন হাদীস অনুযায়ী সঠিক পথে না থাকি আজই মসজিদ সহ তোমাদের সাথে চলে যাবো। আর আমরা ঠিক থাকলে তোমরা কি করবে? উগ্রবাদী মোল্লার দল আলেম নামধারী যালেমরা তাঁর ওপর আক্রমণ চালায়। শহীদ শাহ আলম সাহেব নিরবে মার খেতে থাকলেন।

আজ কিছু নামধারী যারা ইসলামের কথা বলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত দাবী করেন। সেই নামধারী যালেমরা তাঁকে যখন মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিল তখন রক্তে তাঁর পাঞ্জাবী লাল হয়ে গেল। তখন তাঁকে হাসপাতালে নিতে চাইলে তারা তাতে বাঁধা দেয়। এমতাবস্থায় খাকসারের আম্মা ও বাড়ির আরো ২/৩ জন লাজনা, আক্রমণকারীদের একজনের পায়ে জড়িয়ে ধরে মিনতি করে বলেন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেওয়া হোক, উনি তো মারা যাবেন। অত:পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে যাওয়ার পথে তাঁকে রাস্তায় ২/৩ বার আটকানো হয় এভাবেই তিনি আহতাবস্থায় যন্ত্রণায় জর্জরিত হন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রিয় বান্দাকে শাহাদাৎ এর মর্যাদা দিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

একজন আহমদী হিসেবে যা যা গুণ থাকা দরকার মহান আল্লাহ্‌র অশেষ ফজলে তাঁর সব গুণই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি জামাতের কাজে কোথাও গেলে আগে সদকা দিতেন এবং জামাতের চাঁদা দিতেন। ভাইদের চাঁদা দেওয়ায় অভ্যস্ত করার জন্য নিজ পকেট থেকে ভাইদের চাঁদা ও দিতেন। আল্লাহ্‌র অশেষ ফজলে আজ তার ভাই ও উত্তর সূরীরা জামাতের সাথে আছেন এবং নিয়মিত চাঁদা আদায় করেন। তিনি শাহাদাৎ বরণ করার ৩/৪ বছর পূর্বেও স্থানীয় স্কুলের মাঠে গয়ের আহমদীরা কয়েকজন আলেম ডেকে আনে এবং তিনি উক্ত আলেমদের সাথে বাহাসে বসেন। তখনও যদি তিনি তাদের কথামত একথা মেনে নিতেন যে, তিনি আহমদী নন তাহলে হয়ত এই ঘটনা ঘটতো না। অথচ তিনি আহমদীয়াতের ওপর এমনভাবে অটল ছিলেন যে, স্থানীয় নন আহমদীদের কোনো পারিপার্শ্বিক চাপই তাঁকে আহমদীয়াত থেকে বিরত রাখতে পারে নি।

অথচ যারা তাঁকে মারলেন তাদের মধ্যে ১ জনকে তিনি ২ দিন আগেও সার কিনবার জন্য ৩০০/- টাকা দিয়েছিলেন এবং ৩/৪ জন আগের দিন তাঁর বাড়িতে খাওয়া দাওয়াও করেছেন। আজ নাম সর্বস্ব যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি যার প্রেম, ভালবাসা ছিল তাঁকে হত্যা করেছেন সেই আলেমদের ভয়ঙ্কর পরিণতি হচ্ছে। কেননা যারা আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদকে ফুটবল খেলার মাঠ ও কুরআন শরীফকে ফুটবল বানায় (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তো তার শাস্তি দিবেন-ই। যারা আহমদীয়াতকে মুছে দেওয়ার জন্য শাহ্ আলম সাহেবকে হত্যা করলেন তাঁর প্রতিদানে মহান আল্লাহ্ তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ তথা বিশ্ব আহমদীয়াতকে মর্যাদার অন্যতম স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

শহীদ শাহ আলম সাহেব আমাদেরকে শিখিয়েছেন কিভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এবং হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রেমে নিজেকে বিলীন করতে হয়। তাঁর এই কুরবানী আল্লাহ্ কবুল করুন, তাঁর সন্তান ও পরিবারের জন্য দোয়ার অনুরোধ আল্লাহ্ যেন তাঁদেরকে তাঁর বাবার কুরবানীর মান বোঝার তৌফিক দেন, আমীন।

Dr. Nazifa's Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka – 1212

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

ঘুরে আসলাম পবিত্র স্থান কাদিয়ান

খালেদ বিন কাসেম, ঢাকা

প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের হৃদয়ের এক পরম আকাংখা যে, ইসলামের নতুন যুগের পবিত্র ভূমি কাদিয়ান সফর করা। একজন আহমদী মুসলিম হিসেবে আমার হৃদয়েও পরম চাওয়া ছিল এই পবিত্র ভূমি ভ্রমণের। এর আগেও আমার কাদিয়ান ২ বার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯৯১ ও ২০05 সনে। এবার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ভিন্ন, তখনকার কাদিয়ান এবং বর্তমান ২০১৯-এর কাদিয়ানের মধ্যে অনেক পার্থক্য, চারিদেকে উন্নয়নের ছাপ। এবার আমার ভ্রমণের সময় সাথে আমার বিবি ছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল যেন বেহেশ্‌তে ঘুরাফেরা করছি এবং কাদিয়ানের সকল মানুষকে মনে হচ্ছিল ফেরেশ্‌তা।

প্রথমত যাওয়ার সময় ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সহযোগিতা এবং সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ তাঁদের অনুপ্রেরণায় এবং সহযোগিতায় আমাদের ভ্রমণ অত্যন্ত সহজ হয়েছিল। কাদিয়ানে যাদের সাথে দেখা হবে তাদের সালাম পৌঁছাতে বলা হয়েছিল আমি সেই মোতাবেক তাদেরকে সালাম পৌঁছিয়েছি। আমরা কাদিয়ান পৌঁছি ২৭ অক্টোবর রাত ১১ টায়। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় "Langar Khana (Darul Ziafat) Qadian" আমরা ৯ দিন কাদিয়ান অবস্থান করি। আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল বর্তমান হুযূরের মেয়ের জামাই জনাব Fateh Ahmad Dahri Sahib (Wakil Sahib, Tamil-O-Tanfidh)-এর সাথে মোলাকাত করার এবং তিনি বাংলাদেশের আহমদীদের কাদিয়ানে সফরের জন্য বলেন এবং আমাকে সবাইকে বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এরপর প্রতিদিন BAIT-UD DUA-তে কোন দিন ২ বার কোন দিন ৩ বার কোন দিন ৪ বার দোয়া করার সৌভাগ্য হয়।

কাদিয়ানের মহল্লাগুলি ঘুরে ঘুরে কেটে গেল। যখনই কাদিয়ানের পথে হাঁটছিলাম মনে হচ্ছিল এপথেই এ যুগের ইমামের পদধূলি পড়েছে। নগরীর দেয়ালগুলো আজও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত। কাদিয়ানে সব থেকে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যায় প্রত্যেক নামায শেষে। নামাযের শেষে মসজিদগুলো থেকে মুসল্লীদের লম্বা লাইন। পথে পথে আহমদী ভাইদের সালাম বিনিময় মদীনা মুনাওয়ারার কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে রচিত হয়েছিল ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সর্বোত্তম নিদর্শন। পহেলা জুলাই দুপুরে সর্বপ্রথম বায়তুদ দোয়ায় দু'রাকাত নামায পড়ার সৌভাগ্য লাভ করলাম। বায়তুদ দোয়া সেই কক্ষ যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদা তা'লার কাছে বিগলিত চিত্তে দোয়া করতেন। যখন সেখানে সিজদা দিলাম নিজের কৃত সকল ভুল পাপের জন্য যেন দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসলো। সেখানে লম্বা সিজদায় মনভরে নামায আদায় করলাম। যতদিন ছিলাম যখনই সুযোগ পেতাম বায়তুদ দোয়ার পাশাপাশি বায়তুয্ যিকর এবং লাল কালি ছিটার সেই বিশেষ কক্ষ যেখানে লাল কালির নিদর্শন সংঘটিত সেখানেও হয়েছিল, নামায পড়লাম। মূলতঃ সবখানেই নামায পড়ার সুযোগ খুঁজতাম। কিন্তু এসব জায়গায় নামাযের বিশেষ সময়সূচি ছিল আর তা হল, বাদ ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত মহিলাদের জন্য আর বাকি সময় পুরুষদের জন্য, এছাড়া মসজিদে আকসাতেও নামায আদায় করি। পাশে মিনারাতুল মসীহ্ এবং সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পিতার কবর যা মসজিদে আকসার প্রাঙ্গণে অবস্থিত। হযরত দাদাজানের কবরও যিয়ারত করলাম। কাদিয়ান আসার পর থেকেই মনবাসনা ছিল সেই সব সাহাবী বীর দরবেশদের সাথে সাক্ষাৎ করার যারা ১৯৪৭-এর পরবর্তী সময়ে খোদা তা'লার অনুগ্রহের হাত হয়ে কাদিয়ানের রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। এই সুযোগ খুঁজছিলাম আর এর মাঝেই একদিন আসরের নামাযের পর পরিচয় হলো আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের সাথে যিনি দারুয্ যিয়াফতে খাদেম হিসেবে কর্মরত আছেন। তার মাধ্যমে দরবেশ আব্দুল মোতালেব সাহেবের কথা জানতে পারলাম। রাজ্জাক সাহেব সদা হাসি খুশি মানুষ, অনেক খেয়াল রেখেছেন খাকসারের। আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরের দিন সকালে বেহেশ্‌তী মাকবেরায় গেলাম এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জানাযা যেখানে হয়েছিল সেটি দর্শন করলাম। কবরগুলোর মাঝে উথলী জামাতের খালিদ সাহেবের কতবা খুঁজলাম,

কিন্তু পেলাম না। আসরের পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন জলসা সালানার ইতিহাসের নিদর্শন বয়ে চলা বিভিন্ন সময় ব্যবহৃত জলসাগাহ দেখতে যাই। সময়ের সাথে সাথে জামাতের কলেবর বেড়েছে আর জলসাগাহ বড় থেকে আরো বড় হচ্ছে। বর্তমান জলসাগাহ বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাচ্ছে আহমদীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির সাথে সাথে। জলসা সালানার মৌসুম ছাড়া এখানে বিভিন্ন ইজতেমা ও খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

০৩/০৭/২০১৯ তারিখে এক আহমদী ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়। ভদ্রলোকের নাম মোকাররম কালিমুদ্দীন। তিনি ঠিকাদার হিসেবে জামাতের বিভিন্ন নির্মাণ কাজ করেন। তিনি আমাকে তার মটর সাইকেলের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্মাণ কাজ ও জামাতের বিভিন্ন প্রোপার্টি ঘুরে ঘুরে দেখান। ধন্যবাদ তাকে তিনি আমাকে সাহায্য না করলে জামাতের এত বড় বড় প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে পারতাম না। আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

০৪/০৭/২০১৯ তারিখ যোহর নামাযের পর ভাই জালালুদ্দিন সাহেব আমাকে কাদিয়ানের পবিত্র স্থানসমূহ দেখান। জালালুদ্দিন সাহেব দরবেশ মোতালেব সাহেবের পুত্র যিনি দীর্ঘকাল জামাতে ওয়াকফে যিন্দেগী হিসেবে সেবা করেছেন। তিনি আমাকে কাদিয়ানের পবিত্র স্থানসমূহ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করে শুনান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর (আ.)-এর কাচারী ঘর এবং খানদানের অন্যান্য সকল ঘর ঘুরে ঘুরে দেখি, এই সকল ভবনের প্রাচীন স্থাপত্যকলা এখনো দেয়ালে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এর সাথে রয়েছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তার সাহাবীদের অমর গাথা কাহিনী। মনে হয় এসব ঘর থেকে আধ্যাত্মিকতার এক সুমিষ্ট সুবাশ ছড়াচ্ছে যা সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে মাকামে মসীহের দিকে আকর্ষণ করছে।

পরের দিন জামাল ভাই সাহেব আমাকে কাদিয়ানে জামাতের বিভিন্ন গেষ্ট হাউস এবং জামেয়া ভবন দেখান। অনেক দেশ কাদিয়ানে নিজস্ব গেষ্ট হাউস নির্মাণ করেছে। এছাড়া হযরত স্যার জাফরুল্লাহ্ খান চৌধুরী সাহেবের বাড়ি এবং আমাদের ন্যাশনাল আমীর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান সাহেবের নানার বাড়ি এবং ফজলে ওমর প্রিন্টিং প্রেস ঘুরে দেখি। এছাড়া নূর হসপিটালও দেখেছি। ৬ তারিখ সকালে আহমদী ভাই নূর হোসেনকে সাথে নিয়ে অমৃতসর দেখার জন্য রওয়ানা হলাম। অমৃতসরে স্বর্ণ মন্দির সহ বৃটিশ আন্দোলনের বিভিন্ন নিদর্শন দেখে বিকেল নাগাদ কাদিয়ানে ফিরে আসি। ৩ দিন থেকে মনটা কাঁদতে শুরু হলো আর ক'দিন পরেই চলে যাব ছেড়ে যাবো এই পবিত্র শহর। যেহেতু বিদায়ের ক্ষণ এগিয়ে আসছিল তাই ভালোবাসার শহরকে আরো দেখার ইচ্ছা জাগলো। পায়ে হেঁটে পুরো কাদিয়ান কয়েকবার দেখলাম। কাদিয়ানের অলিগলিতে প্রায় ২২টি মসজিদ রয়েছে। চেষ্টা করলাম যত বেশী মসজিদে নামায পড়তে পারি। কয়েকজন আহমদী ভাইয়ের বাসায় দাওয়াতে যোগ দিলাম। কাদিয়ানের আহমদীদের আদর আপ্যায়ন অতুলনীয়। যেহেতু বিদায়ের ক্ষণ এগিয়ে আসছিল তাই পরিবারের জন্য দোয়ার আংটি ও বোরকার কাপড় ক্রয় করলাম।

০৮/০৭/২০১৯ তারিখ সেই দিন-ক্ষণ এসে হাজির হলো। কাদিয়ান থেকে আমার বিদায়ের দিন এসে হাজির হয়। সকাল থেকেই মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল। আজই আমার শেষ দিন এই পবিত্র শহরে। শেষবারের মত বেহেশ্‌তি মাকবেরায় দোয়া আর পবিত্র বরকতময় সকল জায়গায় দোয়া করে বাদ যোহর অমৃতসরের উদ্দেশ্যে রওনা করলাম। লঙ্গরখানা থেকে হালকা নাস্তা সাথে দিয়ে দিল। ৮ তারিখ সন্ধ্যায় অমৃতসর থেকে আমার কোলকাতার ট্রেন ছিল। আমি ১০ তারিখে কোলকাতা পৌঁছাই আর সেদিনই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি পৌঁছি। যাত্রাপথে বার বার কাদিয়ানের বিভিন্ন স্মৃতি আমার হৃদয়ের কোণে উঁকি দিচ্ছিল। সাথে দোয়া করছিলাম, হে আল্লাহ্! আমি যেন বার বার এই মোবারক নগরীতে আসতে পারি। এক বরকতের কথাও এখানে উল্লেখ করতে চাই। পুরো ১৫ দিনের সফরে এক মুহূর্তের জন্যও আমার বাড়িতে কোন সমস্যা হয়নি, এক অজানা অদ্ভুত প্রশান্তি আমাকে ঘিরে রেখেছিল। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে বারবার কাদিয়ানে গিয়ে স্বীয় ঈমানকে তরতাজা করার সামর্থ্য দান করুন, আমীন।

৩ মার্চ, ২০১৭ তারিখের জুমুআর খুতবায় 'বিবাহ সংক্রান্ত' বিষয়ে হুযূর (আই.) দিক নির্দেশনা

"মহানবী (স.)-এর এই কথা সবসময় স্মরণ রাখতে হবে, যাতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সময় অগ্রাধিকার প্রদান করার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যা রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, **'চারটি কারণে কোন মেয়েকে বিয়ে করা হয়: প্রথমত তার সম্পদের কারণে, দ্বিতীয়ত তার বংশের কারণে, তৃতীয়ত তার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং চতুর্থত তার ধার্মিকতার কারণে। অতএব তোমরা ধার্মিক মেয়ে নির্বাচন কর, আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করবেন।'** এ কথা যদি ছেলেরাও এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাও সামনে রাখে, তাহলে মেয়েরা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা অবশ্যই ধর্মকেই প্রাধান্য দেবে।

আর ধর্ম যদি অগ্রাধিকার পায় তাহলে অনেক অভিযোগ-অনুযোগ যা মেয়ে এবং ছেলে এবং তাদের পরিবার সম্পর্কে পরস্পরের মাথায় দানা বাঁধে, তা দূর হয়ে যাবে। আর যেই ছেলে ধার্মিক মেয়ের সন্ধানে থাকবে আর ধর্মকে অগ্রাদিকার প্রদান করবে, তাকে নিজের আমল বা ব্যবহারিক আচার-আচরণও ধর্মীয় শিক্ষাসম্মত করতে হবে। আর যে ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণ করবে, তার ঘরে বিনা কারণে ছোট ছোট বিষয়ে ফিতনা এবং নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে না।"

সংবাদ

সংকলন: মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

তেজগাঁও জামাতে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ নভেম্বর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেজগাঁও এর উদ্যোগে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম সাহেব। নযম পরিবেশন করেন জনাব শাহিন আহমেদ। বক্তৃতা পর্ব: **'নিশ্চয় আমাদের রসূলের (সা.) মাঝে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ'** এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম। দরুদ শরীফের ওপর নযম পরিবেশন করেন জনাব রাহুল আলিম। **'রসুল (সা.)-এর প্রেমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)'** এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ কাইসার আলম সাহেব। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন, জনাব মোহাম্মদ মাকসুদ উল হক। **'প্রিয় নবীর শান ও মর্যাদা'** এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব এ এস এম শহীদুল ইসলাম (বাদল)। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ জিকরে এলাহী। **'মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় জীবনাদর্শ'** এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মোহতরম মোহাম্মদ আব্দুল করিম স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। এ ছাড়াও মাওলানা মাহমুদ আহমদ সুমন বক্তৃতা করেন এবং শেষে সভাপতি মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে অতিথিদের সাথে কুশল বিনিময় এবং প্রশ্ন উত্তর প্রদান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। সভায় বেশ কতক নন আহমদী ভাইসহ প্রায় ১০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে সবাইকে আপ্যায়ণ করা হয়।

মোহাম্মদ আব্দুল করিম, প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও

কুষ্টিয়াতে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৪, ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কুষ্টিয়ার উদ্যোগে কুষ্টিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে ৫ম স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ ডিসেম্বর, শনিবার সকালে স্থানীয় কায়েদ সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত ক্লাসের কর্মসূচী শুরু হয় এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ শাহীন সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে টিটি ক্লাসের উদ্বোধন হয়।

খোদ্দাম ও আতফালের আলাদা আলাদা ক্লাস করানো হয়। স্থানীয় মুরুব্বি সাহেব ও অতিথি খাদেম আতাউল মোশায়ের ক্লাস পরিচালনা করেন। খোদ্দাম ও আতফালের ক্লাসের মধ্যে ছিল কুরআন নাযেরা, কোরআন হিফজ, নযম বাংলা, নযম উর্দু, নামায শিক্ষা, আযান ও ইকামত শিক্ষা, বক্তৃতা, দ্বীনি মালুমাত ও সাধারণ জ্ঞান। এভাবেই সারাদিন ক্লাসের রুটিন সাজানো হয়।

মাগরিবের পর সারাদিনের ক্লাসের পর্যালোচনা করা হয় ও গ্রুপ ভিত্তিক মান অগ্রগতির রিপোর্ট নেয়া হয়। (খোদ্দাম-আতফালের সমন্বয়ে ২ টি গ্রুপ বানিয়ে দেয়া হয়, এতে দুর্বল বা পিছিয়ে পড়া খাদেম/তিফলদেরকে জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে গ্রুপের অন্য খাদেমরা সাহায্য করে)

১৫ ডিসেম্বর, বিকাল ৩ টায় শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে লালনের আখড়া বলে খ্যাত ছেউড়িয়াতে যাওয়া হয়। একই দিন সন্ধ্যার পর থেকে খোদ্দাম/আতফালের রিভিউ ক্লাস রাত ১১টা পর্যন্ত চলে।

১৬ ডিসেম্বর, থেকে প্রতিযোগিতা পর্ব শুরু হয়। খোদ্দামের ৪ টি ইভেন্ট ও আতফালের ৭ টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয় ও সবশেষে প্রধান আকর্ষণ কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। খেলাধুলা হিসেবে খোদ্দামের জন্য ছিল চোখ বেঁধে নারিকেল ভাংগা ও আতফালের জন্য ছিল

স্মৃতি-শক্তি পরীক্ষা। তারপর ওয়াকারে আমলের কর্মসূচি হিসেবে মসজিদ ও মসজিদ প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়।

একই দিন বিকেল ৩:০০ টা থেকে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়।

জেলা কায়েদ জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ শাহীন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব শহিদ উদ্দিন আহমেদ নিপু। বক্তৃতা পর্ব শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে সভাপতি সাহেবের অনুরোধে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব জনাব গোলাম আহমদ শাহীন দোয়া পরিচালনা করেন। আহাদনামা পাঠের মাধ্যমে উক্ত তালিম তরবিয়ত ক্লাস এর সমাপ্তি ঘটে।

উক্ত তালিম তরবিয়ত ক্লাসে ৫ জন খোদ্দাম ও ৮ জন আতফাল অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্ সদস্যরা ৩ বেলার রান্নার কাজটুকু করে দেন, আল্লাহ তাদের খেদমত গ্রহণ করুন। তাছাড়া ও উক্ত ক্লাসটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় আহমদিরা ও আর্থিক কোরবানি পেশ করেন। মহান আল্লাহ তা'লা তাদের সকলের ছোট বড় কোরবানিকে গ্রহণ করে নিন।

কোড্ডা জামাতের উদ্যোগে তালিম ও তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত কোড্ডার উদ্যোগে কোড়াবাড়ি হালকার মরহুম সুবেদার তাহের বীরপ্রতীক সাহেবের বাসায় তালিম ও তরবিয়তি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট জনাব মোস্তাক আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব রাজিব উদ্দিন আহমদ (দিপু), নযম পরিবেশন করেন তিষা মণি। বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মাষ্টার মামুনুর রশিদ, এজাজ আহমদ, আবু সায়েদ মিয়া আব্দুল হাকিম (মোয়াল্লেম)। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সভায় ১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

এজাজ আহমদ, সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কোড্ডা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।
মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, ০১৯১২৭২৪৭৬৯

ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

Hakim Water Technology & Filter House
Helpline: 01711 33 89 89, Tell: +88-02-7540545
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

OUR SERVICES:
Drinking Water Plant, ETP, STP, DMP, Swimming Pool Plant, Iron Removal, Juice Processing Plant, Soft Drink Plant, Indoor Fishing, Chemicals ETC.
VISIT OUR PAGE & LIKE:
/hakimengineering | /hakimwatertechnology | /hakimindoorfishfarming /hakimwatertechnology

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক হতে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

New Vol. No. 82 | 12th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st December, 2019 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমূত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগেই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)